রূপটান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

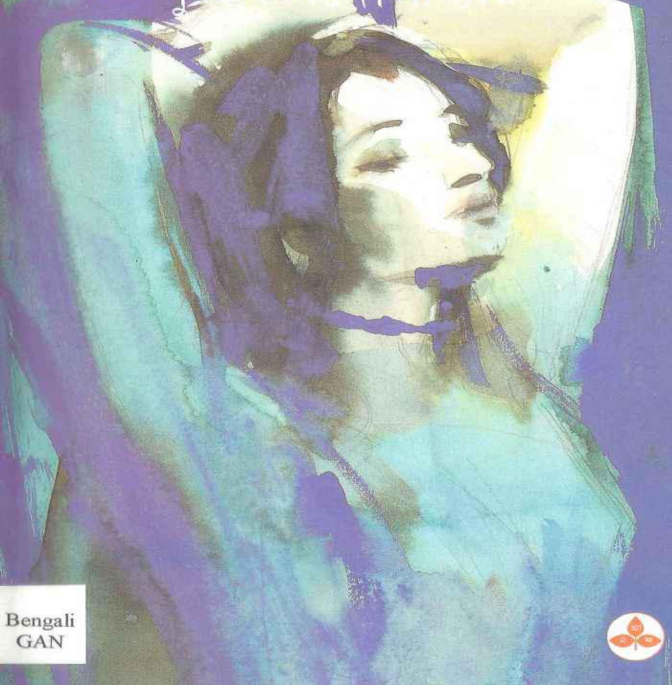

Bengali
GAN

কটা বাজে ? কটা বাজে ?

ঘর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সব কটি জানলায় ভারী পর্দা টানা, বাইরে এখন রাত্রি না সকাল তা বোঝার উপায় নেই। ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার কথা ছিল, বেজে গেছে কি না কে জানে। শিখার মনে হলো, বাইরে ঝকঝক করছে রোদ।

ধড়মড় করে উঠে বসে সে আতঙ্কিত গলায় বললো, এই, এই, যাঃ অনেক দেরি হয়ে গেছে। কী হবে ?

অনীশকে দু' তিনবার ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হলো। সে শিখার মতন সহজে উত্তেজিত হয় না। চোখ না মেলেই বললো, কটা বাজে ? ঘড়িটা দেখো না।

শিয়রের পাশেই একটা ছোট টিপয়ের ওপর ঘড়িটা রয়েছে। অন্ধকারেও তার কাঁটা দেখা যায়। যেন দারুণ একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে, এই ভাবে শিখা বললো, ছটা কুড়ি!

অনীশ বললো, শীট ! অ্যালার্ম বাজলো না কেন ?

চোখ মুছতে মুছতে সেও উঠে পড়ে বললো, এমন কী আর মহা বিপদ হয়েছে ? তোমার মামা ফোন করবেন। উনি তো আর নতুন নন যে ঘাবড়ে যাবেন ? আমি পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

growthagar.weebly.com

মাটিতে পা দিয়ে সে একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে মহা বিরক্ত হয়ে সে বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? না চোখের মাথা খেয়েছো ? বললাম, অ্যালার্ম বাজেনি। এখন সাড়ে চারটে !

আবার সে ধপাস করে মাথা দিল বালিশে।

অ্যালার্ম বাজার কথা ভোর পাঁচটায়।

শিখা আর বিছানায় ফিরে গেল না। অনীশের কাঁধে একটা চুমু দিয়ে ফিসফিস করে বললো, সরি, তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি একটু বাদে চা করে আনছি।

পাতলা নীল রঙের রাত পোশাক পরা, শিখার শরীরের বাঁধুনি

এখনো এমন চমৎকার যে তাতে অনায়াসে দিব্যি তাকে যুবতী বলা যেতে পারে। যদিও তার মেয়েরই বয়েস উনিশ, ছেলের বয়েস পনেরো।

আলো না জ্বেলে সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, ঢুকে পড়লো বাথরুমে। দাঁত মাজার আগেই সে খুলে ফেললো পোশাক। বেসিনের ওপর দেয়াল জোড়া আয়না। প্রত্যেকদিন প্রথম বাথরুমে এসেই একটা কথা মনে পড়ে। একটা ভয়। এ দেশে মাঝবয়সী মেয়েদের ব্রেস্ট ক্যানসার হয় আকছার। শিখার এক সহকর্মীর একটি স্তন অপারেশান করে বাদ দেওয়া হয়েছে গত মাসে। সে কথা ভাবলেই শিখার বুক কেঁপে ওঠে।

শিখা আয়নার সামনে নিজের বুকে হাত দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করতে লাগলো। ডাক্তারের নির্দেশ, কোনো জায়গা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে কি না, তা নিজেকেই দেখতে হবে। অনীশকে দেখতে বললে সে ইয়ার্কি করে। শিখার স্তনদুটির গড়ন অনেক মেয়ের কাছেই ঈর্ষণীয়।

প্রায় মিনিট দশেক নিজের বুক পরীক্ষা করার পর শিখা আশ্বস্ত হলো। সে আয়নাকে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ।

grothagar.weebly.com

খানিক বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে শিখা ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে। এ দেশে অবশ্য কেউ রান্নাঘর বলে না, সবাই বলে কিচেন। রান্নাঘর শুনলেই মনে হয় দেয়ালে ঝুল কালি, তাকের ওপর রাখা সারি সারি টিনের কৌটো। শিখার কিচেন একেবারে ঝকঝকে তকতকে, সব কিছুই যেন নতুন। ওয়াল পেপারে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক। চায়ের জন্য জল চাপিয়ে শিখা একটা স্পঞ্জের ন্যাতা নিয়ে ওভেনের অদৃশ্য ময়লা মুছতে লাগলো।

দিনের প্রথম কাপ চায়ের সঙ্গে শিখা দু'খানা চৌকোনা বিস্কিটে মার্মালেড মাখিয়ে খায়। অনীশ খেতে চায় না কিছুই। ব্রেকফাস্টের আগে সে এক কাপ চা ও দু' কাপ কফি খায় শুধু মুখে। শিখার ধারণা, খালি পেটে চা-কফি খাওয়া ভালো নয়, রোজই সে অনীশকে দু' একখানা অন্তত বিস্কিট খাওয়ার জন্য পেড়াপিড়ি করে, কিন্তু অনীশ কিছুতেই অভ্যেস বদলাবে না।

চা বানাতে বানাতে শিখা শুনতে পেল ওপরের ঘরে অ্যালার্ম বাজছে।

ট্রেতে টি-কোজি দিয়ে ঢাকা টিপট, আলাদা দুধ ও চিনি, বিস্কুটের কৌটো সাজিয়ে শোবার ঘরে চলে এলো শিখা। বেড সাইড টেবলে

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে সে বললো, টি ইজ রেডি, ইয়োর ম্যাজেস্টি !

অনীশের মৃদু নাক ডাকছে।

চওড়া বুক, লম্বায় ছ' ফুট, অনীশ মধ্যবয়স্ক সুপুরুষ, শুধু তার চুলে কালোর চেয়ে সাদা বেশি। সেই জন্য তার বয়েসটা বাহান্নর চেয়েও বেশি মনে হয়, তবু কলপ মাখা সে পছন্দ করে না। মাথায় চুলের চেয়েও অনীশের গোঁফ বেশি পাকা, শিখা কতবার বলেছে গোঁফটা কামিয়ে ফেলতে। কিন্তু স্ত্রীর আবদার মেনে চলার মানুষ নয় সে। একটা খয়েরি-সাদা ডোরাকাটা স্লিপিং সুট পরে আছে, বুকের বোতাম সব খোলা। সারা শরীরে তার ঘুমের আমেজ।

ওর বাহুতে হাত ছুঁইয়ে দু' তিনবার ডাকলো শিখা, অনীশ শুধু উঁ উঁ করতে লাগলো।

শিখা বললো, অনীশ, চা এনেছি, এবার ওঠো।

অনীশ জড়ানো গলায় বললো, আমি এখন চা খাবো না !

—এখন কিন্তু পাঁচটা দশ বাজে।

—জানি।

grontagar.weebly.com

—সাড়ে পাঁচটায় বেরুতে হবে।

—উঁ ? হুঁ, সাড়ে পাঁচটা। তুমি একাই চলে যাও না।

—তুমি যাবে না ?

—দু' জনের যাবার কি কোনো দরকার আছে ? রোববার সকালে একটু ঘুমোবো। প্লিজ, একটু কনসিডার করো।

—তুমি তা হলে যাবে না ? সে কথা আগে বললেই পারতে !

অনীশ চোখ না মেলেই কথা বলে যাচ্ছে। এবার সে একটা হাত বাড়িয়ে শিখার উরু খুঁজে পেল। সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, শিখামণি, সুইটিপাই, তুমি চট করে গিয়ে নিয়ে এসো তোমার মামাকে ! শুধু শুধু দু' জনে যাওয়ার রিয়েলি তো কোনো দরকার নেই !

অনীশের আদুরে গলা শুনেও শিখা নরম হলো না। তীক্ষ্ণভাবে বললো, আমার মামা আসছেন, তাই তুমি আনতে যেতে চাও না। যদি তোমার বাড়ির কেউ হতো ? তোমার বাবা-মা এলে আমাকেও সেজেগুজে এয়ারপোর্টে হাজিরা দিতে হয় না ?

এবার অনীশকে চোখ খুলতেই হলো। অনুনয় করে বললো, সকালবেলাতেই ওসব শুরু কোরো না। তোমার মামা আসছেন, খুব ভালো কথা, আমি খুশি হয়েছি। তোমার মামাকে আমি চিনি না। যদি চিনতাম, আমি একাই চলে যেতাম তাঁকে আনতে। তুমি আর

একটু ঘুমিয়ে নিতে পারতে। তুমি তাকে চেনো, চট করে নিয়ে চলে এসো। এত সকালে পার্কিং স্পেস পেতে অসুবিধে হবে না।

শিখা বললো, তুমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলে তুমি যাবে না! কাল রাত্তিরে শুধু শুধু অত আদিখ্যেতা করলে কেন?

অনীশ আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হচ্ছে।

সে বললো, রোজ ঠিক সওয়া ছটায় আমাকে কাজে যেতে হয়। রোববার একটু বেশি ঘুমোতে পারবো না? তোমার মামা রবিবারের এত আর্লি মর্নিং ফ্লাইট ধরতে গেলেন কেন? কোনো কনসিডারেশান নেই!

—তুমি তা হলে যাবে না?

—প্রয়োজন নেই তাই যাবো না। খুব প্রয়োজন থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম।

—মিকি সাড়ে সাতটার সময় সাঁতারের ক্লাবে যাবে।

—সে আমি দেখবো!

নিজের চা ঢেলে কাপটা নিয়ে শিখা চলে এলো একটা জানলার ধারে। পর্দা সরিয়ে দেখলো বাইরে। ভোরের আলো ফোটার কোনো চিহ্ন নেই, মনে হয় যেন পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে তুষার। শীত এসে গেল। এ বছরের তুষারপাত শুরু হয়েছে তিন-চারদিন আগে।

অন্যদিন শিখা জিনস আর শার্ট পরে বেরোয়, আজ মামা আসবেন, তাকে শাড়ি পরতে হবে। মামা আসবেন বলে তিন-চারদিন ধরে শিখা খুব উত্তেজিত। মামা কী কী খেতে ভালোবাসেন, কোন্ কোন্ জায়গা তাঁকে ঘুরিয়ে দেখানো হবে তা নিয়ে বারবার আলোচনা করেছে অনীশের সঙ্গে। গতকাল রাতে তিন গেলাস মদ্যপানের পর অনীশ হাসতে হাসতে বলেছিল, ওঃ, তোমার মামার কথা শুনতে শুনতে যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! তোমার মামা খুব গুণী মানুষ, তা তো জেনে গেছি। কিন্তু তোমার মামা আটবার অ্যামেরিকায় এসেছেন, কোনোদিন নিজের পয়সায় টিকিট কেটে আসেননি, এই কথাটা কতবার শুনবো?

দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ না কেউ আসেই মাঝে মাঝে। তবে শিখা আর অনীশের মধ্যে শিখার আত্মীয়রাই আসে বেশি। অনীশের ভাই-বোন নেই। সে একমাত্র ছেলে, তার বাবা-মা একবার বেড়াতে এসেছিলেন এখানে। কিন্তু শিখার দুই দাদা কয়েকবার এসেছে, এক কাকা প্রায়ই আসে, দিদি-জামাইবাবু ঘুরে

করলো।

শিখা বললো, আজ মামা আসছেন, এই ঘরটা তো ছেড়ে দিতে হবে রে! তুই ঘুমোতে চাস আরও ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নে। তারপর ঘরটা একটু গুছিয়ে টুছিয়ে রাখিস লক্ষ্মীটি। তোর দরকারি জিনিসপত্রগুলো রেখে দিস মিকির ঘরে।

টিনা ভুরু কুঁচকে বললো, আমি কি মিকির ঘরে থাকবো নাকি?

শিখা বললো, রাত্তিরে বেসমেন্টে শুবি।

—উনি ক'দিন থাকবেন?

—তা আমি আগে থেকে কী করে জানবো? বেশিদিন নিশ্চয়ই নয়। আর শোন, মিকি সাঁতার কাটতে যাবে, ওকে দুটো ডিমের পোচ বানিয়ে দিতে পারবি?

—পারবো না কেন? ছোড়দি, আজ দুপুরে আমার একটা লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে।

—সে কি রে, আজ মামাবাবু আসছেন, তুই চলে যাবি?

—আগে থেকেই যে ঠিক হয়ে আছে। তোমাকেও আগে বলেছি।

—ঠিক আছে, একটু দেরি করে যাস। ঘরটা ঠিকঠাক করে রাখিস কিন্তু।

granthagar.weebly.com

টিনা মামাবাবুকে প্রায় চেনেই না। ছোটবেলা দু' একবার দেখেছে মাত্র। শিখাও মামাবাবুকে দেখেছে সাত বছর আগে। মামাবাবু আমেরিকা আসেন প্রায়ই, কিন্তু শিখাদের বাড়িতে কখনো ওঠেন না। এটা একটা ছোট শহর। এখানে আসার কোনো কারণ ঘটে না তাঁর। প্রতিবারই টেলিফোনে শিখার খোঁজখবর নেন। এবারে তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে ফোন করতেই শিখা বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে কয়েকদিন তার বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য। নিজের মামা, তিনি এদেশে আসবেন অথচ একবার দেখাও হবে না?

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করার পর দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। আর মাসখানেক বাদে এত সহজে গাড়ি বার করা যাবে না। এখানে বড় বেশি বরফ পড়ে, গ্যারাজের বাইরে এক ফুট দেড় ফুট বরফ জমে থাকে, নিজেদেরই বেলচা দিয়ে সেই বরফ সরাতে হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এক একদিন কান্না পেয়ে যায়।

রবিবারের এত ভোরেও শিখার প্রতিবেশী মিসেস জেরুজালেস্কি কুকুর নিয়ে বেরিয়েছেন। কুকুরটাকেও একটা জামা পরিয়েছেন, সেই জামার রং আর তাঁর নিজের ওভারকোটের রং এক। অনীশ এই

বৃদ্ধার লম্বা নামটা সংক্ষেপ করে ডাকে, মিসেস জরু। ফুটফুটে মহিলাটি মিষ্টি হেসে বললেন, হাই ! গুড মরনিং।

শিখাও একই কথা বলে বেরিয়ে এলো বড় রাস্তায়।

গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না শিখার। প্রত্যেকদিন পঁয়তিরিশ মাইল গাড়ি চালিয়ে তাকে অফিস যেতে হয়, মাঝখানে একটা টার্ন পাইকে জ্যাম লেগেই থাকে। এয়ারপোর্টে সে কতবার গেছে, তবু রাস্তা ভুল হয়ে যায়। প্রথম ব্রিজটায় ডান দিকের লেনের বদলে বাঁ দিকের লেন নিলেই দশ মাইল ঘুরে আসার ধাক্কা !

এত সকালেও রাস্তায় গাড়ির বিরাম নেই। চব্বিশ ঘন্টাই সমান গাড়ি। কেউ কেউ চব্বিশ ঘন্টায় যতটা ঘুমোয় তার চেয়ে বেশি সময় গাড়িতে কাটায়। গ্যাস স্টেশনগুলো সারা দিন রাত খোলা। হালকা তুষারপাতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে আছে, গাড়ির চাকায় চট চট শব্দ হচ্ছে।

একটা গাড়ি শিখার পাশাপাশি চলছে কিছুক্ষণ ধরে। শিখা লক্ষ করেনি। অন্য গাড়িটা ছোট্ট একটা হর্ন দিতেই শিখা চমকে তাকালো। এ দেশে কেউ সহজে হর্ন দেয় না। দরজা-টরজা খোলা আছে নাকি ? পাশের গাড়ির কালো চশমা ও টুপি পরা একটা লোক জানলার কাচের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করছে। কাচ নামাতে বলছে নাকি ? গাড়ি গরম করা আছে, কাচ নামালেই হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকবে।

এবার শিখা চিনতে পারলো, পাশের গাড়িতে হেমাঙ্গ বোস। সবাই ওকে বলে বোস সাহেব।

শিখা কাচ নামাতেই হেমাঙ্গ বললো, সুপ্রভাত। সকালবেলা প্রথমেই তোমার মুখটা দেখলাম। দিনটা আজ ভালো যাবে মনে হচ্ছে।

শিখা বললো, সকালে প্রথম দেখেছেন নিজের মুখ। দাড়ি কামাবার সময়। তারপর এতখানি রাস্তা এলেন, অন্তত হাজার খানেক গাড়ির ড্রাইভারদের দেখেছেন।

হেমাঙ্গ বললো, ওসব বাদ দাও। চেনাদের মধ্যে তোমাকে প্রথম.....এমন একখানা সুন্দর মুখ। এই নিয়ে কী একখানা গান আছে না ? কীর্তন ধরনের।

শিখা বললো, জানি না।

হেমাঙ্গ বললো, বাংলা গান টান সব ভুলে যাচ্ছি। তোমার কাছে কিছু ক্যাসেট থাকলে দিও তো। কোথায় চললে ?

—এয়ারপোর্টে। শুনুন, আজ সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসবেন। ছোটখাটো একটা পার্টি হচ্ছে। অনীশ আপনাকে ফোন করতোই।

—উপলক্ষটা কী ?

—সেরকম কিছু না। আমার এক মামা আসছেন।

হেমাঙ্গ মুখখানা বিকৃত করলো। বয়স্ক লোকদের সে একেবারে পছন্দ করে না। সে সব সময় ইয়ার্কির সুরে কথা বলে, মেয়েদের কাছ ঘেঁষে বসে খুনসুটি করে। কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সেটা চলে না।

এ দেশে আসার কিছুদিন পরেই হেমাঙ্গ একটি মেম বিয়ে করেছিল। বছর সাতেক আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। আর সে বিবাহবন্ধনে যেতে চায় না মনে হয়, কিন্তু যখন তখন মেয়েদের প্রেমে পড়ে। পরিচিত যে কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা হলেই সে প্রশংসা করতে শুরু করে, ফ্ল্যাটারি যাকে বলে, সেইজন্য কেউ-ই তার কথায় তেমন গুরুত্ব দেয় না। এর মধ্যে সে টিনার সঙ্গে প্রেম চালাবার খুব চেষ্টা করছে, টিনা যদিও তেমন পাত্তা দেয় না ওকে। হেমাঙ্গ সেলস-এর চাকরি করে, ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই যখন তখন সে যে-কোনো বাড়িতে উপস্থিত হতে পারে। এসে বসে থাকে অনেকক্ষণ, কী রান্না হয়েছে জিজ্ঞেস করে, খাবার টেবিলে বসে অনেকখানি খেয়ে ফেলে। শিখা শনিবারেও কাজে যায়, তাই বুধবার তার ছুটি, বুধবার দুপুরে হেমাঙ্গ আসবেই। যে বাঙালি মহিলারা চাকরি করে না, তারা হেমাঙ্গর প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করে।

হেমাঙ্গ বললো, সন্ধেবেলা তুমি তো ব্যস্ত থাকবে, তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে না।

হাইওয়ে-তে সমান্তরাল ভাবে গাড়ি চালিয়ে গল্প করা যায় না। পেছনে অনেকগুলো গাড়ি জমে গেছে, চালকরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। কাচ তুলে দিতে দিতে শিখা বললো, টিনার সঙ্গে গল্প করবেন।

তারপর সে আবার গতি বাড়িয়ে দিল। হেমাঙ্গ এত সকালে কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞেস করা হলো না।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই, ব্রিজের ওপরে প্রচুর গাড়ি জমে গেছে, শিখার সামনে বড় দুটো ট্রাক। এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে।

শিখা কান্না কান্না গলায় বলে উঠলো, দূর ছাই ! ভাল্লাগে না।

grabinngo.weebly.com

এত বছর এ দেশে থেকেও শিখার এখনো 'শীট' বলা অভ্যেস হয়নি। মুখ দিয়ে 'দূর ছাই' বেরিয়ে আসে।

রেডিও চালিয়ে সে ট্রাফিক-বার্তা শুনতে লাগলো। তেমন কোনো ভয়াবহ জ্যামের খবর নেই। ব্রীজ থেকে নামার পর এক জায়গায় রাস্তা সারানো হচ্ছে তাই সব গাড়ির গতি ধীর হয়েছে। ধীর মানে কি, কচ্ছপ গতি! এই সময় একলা থাকলে বেশি বিরক্ত লাগে। অনীশ থাকলে কথা বলে বা ঝগড়া করেও সময় কাটতো।

অনীশের সঙ্গে খুব তিক্ত ভাবে কখনো ঝগড়া করা যায় না। সে চাঁছাছোলা ভাবে কথা বলে, অন্যের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু সে ছেলেমেয়েদের প্রতি দায়িত্ববান পিতা, নির্ভরযোগ্য স্বামী। পুরুষ হিসেবে তাকে বলা যায় পূর্ণাঙ্গ, অসীম তার আত্মবিশ্বাস। সে পাশে দাঁড়ালে সব সময় ভরসা পাওয়া যায়। সে খানিকটা মেল শোভেনিস্টিক পিগ তো বটেই। কিন্তু শিখা জানে, সে যদি কখনো কিছু মারাত্মক ভুল করে ফেলে, তাহলে অনীশ দারুণ বকুনি দেবে বটে, আবার ব্যাপারটা ঠিক করেও দেবে। অনীশ মুখে কখনো প্রেম-ভালোবাসার কথা বলে না, কিন্তু এক একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এমন আদর করে যে তাতেই বেশ কয়েকদিন শিখার বুক ভরে থাকে।

granthagar.weebly.com

অনীশের এমন কাঠখোট্টা স্বভাব, তবু অনেক মেয়েই তাকে পছন্দ করে।

অনীশ দিব্যি ঘুমোচ্ছে এখন, আর জ্যামে পড়ে গাড়ির মধ্যে ছটফট করছে শিখা।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছোলো শিখা তখনো নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট নামতে সাত মিনিট বাকি।

গাড়ি পার্ক করে সে একটি সিগারেট ধরাল। সারা দিনে সে মোটে পাঁচটি সিগারেট খায়, গাড়িতে কক্ষনো সিগারেট ধরায় না। এখন একটি সিগারেট তার প্রাপ্য।

অনীশ তার মামাকে চেনে না, শিখাও কি চিনতে পারবে? শেষ দেখা হয়েছিল সাত বছর আগে ঢাকাতে। এবারে জীবনমামা টেলিফোনে বললেন, উনি দাড়ি রেখেছেন। এই চেহারা তো শিখা দেখেনি। অবশ্য দাড়িওয়ালা লোক বেশি থাকে না।

সেবারে শিখা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে বেড়াতে গিয়েছিল বাংলাদেশ বিমানে। ঢাকাতে প্রায় সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, তাই সে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে গিয়েছিল। জীবনমামা এয়ারপোর্টে

এসে শিখাদের নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। ছেলেমেয়েরা খুব ক্লান্ত ছিল, ঢাকা শহর বিশেষ দেখা হয়নি।

শিখার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, টাঙ্গাইলে। দেশ বিভাগের পর আর সবাই চলে আসে পশ্চিমবাংলায়, শুধু জীবনমামা আর তাঁর ঠাকুমা রয়ে গেলেন টাঙ্গাইলের বাড়িতে। সেই ঠাকুমা তাঁর স্বামীর ভিটেতেই এক সময় নিশ্চিন্তে চক্ষু বুজেছেন। জীবনমামা তাঁর সাত পুরুষের বাড়িটাকে এত ভালোবাসতেন যে, কিছুতেই ছেড়ে আসতে চাইলেন না। পাকিস্তানী আমলে তিনি স্কলারশিপ পেয়ে কেমব্রিজে পড়তে যান।

এখন ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ছেলেমেয়েরা কোনোক্রমে একবার ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে পারলে আর দেশে ফিরতে চায় না। সেই পঞ্চাশের দশকে এমন হুজুগ আসেনি, ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে যেত, মা-বাবার কাছে জন্মঋণ শোধ করতো।

জীবনময় মিত্র দেশে ফিরে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। এখন তিনি নামকরা অর্থনীতির অধ্যাপক। একাত্তর সালের যুদ্ধের সময় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন। তাঁর কয়েকজন সহকর্মী পাক-আর্মির গুলিতে মারা যান প্রায় তাঁর চোখের সামনে।

granthagar.weebly.com

কোটের ওপর একটা চাদর জড়ানো। মাথায় কান ঢাকা টুপি। গালে এক-দেড় ইঞ্চি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিনিও শিখাকে চিনতে পেরেছেন। হাসলেন।

কাছে এসে বললেন, কী রে কেমন আছিস? ভোরে উঠে আসতে হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, তাই না?

শিখা বললো, তোমাকেও তো মাঝ রাত্তিরে উঠে প্লেন ধরতে হয়েছে!

জীবনময় বললেন, অন্য ফ্লাইটের যে টিকিট পাওয়া গেল না!

শিখা ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে কি-না ভেবে ইতস্তত করছে। এয়ারপোর্টে এত লোকজনের মধ্যে প্রণাম করাটা খুবই অস্বস্তিকর, সবাই অদ্ভুত চোখে তাকায়। অথচ নিজের মামাকে তো হাত জোড় করে নমস্কার জানানোও যায় না।

জীবনময় বললেন, শিখা, আমি সঙ্গে করে আর একজন অতিথি নিয়ে এসেছি। এই ছেলেটি একজন শিল্পী। এখানে কয়েকদিন থাকবে।

জীবনময়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন এক যুবা। বছর তিরিশেক বয়েস। টানা টানা চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, মুখে লাজুক ভাব।

granthagar.weebly.com

শিখা হাত তুলে বললো, নমস্কার।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফেরার পথে শিখা একটি সমস্যার কথা চিন্তা করছিল। জীবনমামা তো একজন অচেনা অতিথি নিয়ে এলেন, এখন এর শোবার জায়গা দেওয়া হবে কোথায়? টিনার ঘরে সিঙ্গল খাট, সেখানে দু'জন শুতে পারবে না। বসবার ঘরের বড় সোফাটায় স্বচ্ছন্দে শুতে পারে, অনেকেই শোয়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছেলেটি ঘুমোয় কতক্ষণ? বসবার ঘর দিয়ে অনবরত যাতায়াত করতে হয় সকালে, তখন সেখানে কেউ ঘুমিয়ে থাকলে অসুবিধে হয় খুবই। টিনাকে মিকির ঘরে জোর করে চালান দিয়ে ওকে বেসমেন্টের খাটটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেশ থেকে যারা নতুন আসে, তাদের মাটির তলার ঘর ঠিক পছন্দ হয় না, অনেকের ঠাণ্ডা লেগে যায়।

গাড়িতে কথাবার্তা বিশেষ হলো না। জীবনময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

অচেনা ছেলেটির জড়তা ভাঙেনি। প্রশ্ন করলে সে দু-একটা শব্দে উত্তর দেয়। শুধু এইটুকু জানা গেল, সে এই প্রথম আমেরিকা আসছে। এর আগে সে প্যারিসে এসেছিল। জীবনমামার সঙ্গে তার সেখানেই দেখা। না, আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়তে আসেনি।

বাড়ি ফিরে শিখা দেখলো, সব কিছুই তার ইচ্ছেমতন হয়েছে। মিকি জলখাবার খেয়ে চলে গেছে সাঁতারের ক্লাবে। টিনা ঘর গুছিয়ে রেখেছে, অনীশ দাড়িটাড়ি কামিয়ে ফিটফাট। ওরা দু'জনে অভ্যর্থনা সমিতির মতন অপেক্ষা করছে বসবার ঘরে।

শুধু একটা কথা বলে যেতে ভুলে গিয়েছিল শিখা। টিনার আজ শাড়ি পরে থাকা উচিত ছিল। সে পরে আছে স্ল্যাক্‌স আর টি-শার্ট। শার্টটা বড়ই পাতলা, ব্রা দেখা যায়।

অতি ভক্তি দেখিয়ে জীবনমামাকে ঝপাস করে প্রণাম করে ফেললো অনীশ। ইনি খুব বিদ্বান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই অনুযায়ী মর্যাদা দিতে হবে তো।

শিখার তাতে সুবিধেই হলো। যেন সে আগে ভুলে গিয়েছিল, এইভাবে সেও প্রণাম সেরে ফেললো। টিনা চট করে সরে গেল সিঁড়ির দিকে। সে কারুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না।

শিখারা দেশ ছেড়ে চলে আসার পর দেশের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা এখন আর কারুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার ধার ধারে না। শিখাদের সময়ে বাড়িতে কোনো গুরুজন এলে বাবা মায়েরা তাকে প্রণাম করতে বাধ্য করতেন।

জীবনময় তাঁর অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে বললেন, এটি আমার এক ছাত্র ছিল। এর নাম সেলিম। বেশিদিন পড়েনি আমার কাছে, ফাঁকিবাজ। তবে ও একজন শিল্পী।

শিখা বললো, মামাবাবু, তোমাদের জিনিসপত্র রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা খুব টায়ার্ড নিশ্চয়ই।

টিনার ঘরে অনীশই সুটকেস দুটো বয়ে আনলো।

জীবনময় বললেন, আরে, এ খাটটা যে বড় ছোট। দু'জনে শোবো কী করে?

সেলিম বললো, কোনো অসুবিধা নাই, আমি নীচের কার্পেটে শুতে পারবো!

অনীশ বললো, কার্পেটে শুতে হবে কেন ? রাত্তিরবেলা অন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দু'জনের জিনিসপত্র এই ঘরে রাখুন।

জীবনময় খাটে উঠে বসে বললেন, সেলিম, তুই গোছল-টোছল যা তো সেরে নে। আমি একটু শুয়ে নিই। পিঠটা ব্যথা করে। শিখা, ব্রেকফাস্ট তৈরি হলে ডাক দিস্। খিদে পেয়েছে বেশ !

টিনা কিচেনে টোস্ট সেঁকছে।

অনীশ বললো, আমি স্যান্ডুইচের জন্য শশা কেটে দেব ?

শিখা বললো, সবাই মিলে এখানে ভিড় করবার দরকার নেই। অনীশ, তুমি যাও টি ভি দেখো গিয়ে। রবিবার সকালে ওটাই তো তোমার নেশা।

অনীশ বললো, ভি সি আর-এ যে ক্যাসেটটা লাগানো আছে, সেটা সরিয়ে ফেলতে হবে। তোমার মামা হঠাৎ দেখে ফেললে মূর্ছা যাবেন।

টিনা বললো, বুড়োমানুষরা অনেক সময় ওইসব দেখতেই বেশি ভালবাসে।

অনীশ বললো, ইনি মস্ত বড় পণ্ডিত !

golpoghar.weebly.com

শিখা বললো, তোমরা জীবনমামাকে নিয়ে ঠাট্টা করছো ? টিনা, তোর লজ্জা করে না ?

টিনা বললো, যাই বলো, ছোড়দি, জ্যাকেটের ওপর চাদর জড়িয়ে এসেছেন, দেখেই আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

অনীশ বললো, পণ্ডিত লোকেরা একটু পাগলাটে ধরনের হয়। আমার বেশ ভালোই লাগে।

আধঘণ্টা বাদে টেবিলে সব খাবার সাজিয়ে অতিথিদের ডাকা হলো। জীবনময় বেরিয়ে এলেন একটা চেক লুঙ্গির ওপর পাতলা সাদা পাঞ্জাবি চাপিয়ে। বাইরে তুষারপাত হলেও বাড়ির মধ্যে বেশ গরম।

এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন লুঙ্গি পরে না।

সেলিম অবশ্য প্যান্ট-শার্টই পরে আছে, কোমরে বেল্ট, পায়ে জুতো মোজা।

শিখা জিজ্ঞেস করলো, আপনি পোশাক বদলালেন না ?

সেলিম লাজুক ভাবে বললো, এই ঠিক আছে।

টেবিলে বসে জীবনময় বললেন, ওরে সর্বনাশ। সসেজ ? আমাকে দিয়েছিস দিয়েছিস, সেলিমকে যেন দিস না। ও মোছলমানের ছেলে, শুয়োর ওর হারাম। এদেশে এসে অনেক

বামুনের ছেলে-মেয়েরাও নিত্য গরু খায়, কিন্তু মুসলমানরা শুয়োর ছোঁয় না। ওরা ওদের ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো বজায় রাখে। কী রে, সেলিম, তুই কখনো পর্ক খেয়েছিস ?

সেলিম সবেগে দু'দিকে মাথা নাড়লো।

শিখা তাড়াতাড়ি তার সামনে থেকে প্লেটটা সরিয়ে নিয়ে বললো, আমি ওকে ওমলেট বানিয়ে দিচ্ছি।

সেলিম বললো, আমার শুধু টোস্ট হলেই হবে।

শিখা থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, আপনি ডিমও খান না ?

জীবনময় বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিম খাবে না কেন ? আমাকেও একটা ওমলেট দিস। শুয়োর-গরু খাওয়া আমারও নিষেধ। রেড মীট দেশে খাই না, কোলেস্টেরলের ভয়ে। ডাক্তাররা ডিম খেতেও দেয় না। বিদেশে এসে সব খাই। এখানকার হ্যাম আর বীফ দুটোরই কোয়ালিটি এত ভালো।

টিনা জিজ্ঞেস করলো, চা না কফি ?

জীবনময় কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন এই তরুণীর দিকে। তারপর বললেন, তুই ... তুই কি তৃণা ? তোকে কত ছোট দেখেছি। গত বছর কলকাতায় একবার তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তুই ছিলি না, দার্জিলিং না কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি।

granthagar.weebly.com

অনীশ বললো, একমাত্র আপনিই ওর আসল নামটা মনে রেখেছেন। ও নিজেই বোধহয় ভুলে গেছে।

জীবনময় বললেন, এ দেশে এসে প্রায় সবাই নাম বদলায়।

অনীশ বললো, কলকাতাতেও ওকে সবাই টিনা বলে। অথচ তৃণা নামটা কত ভালো।

জীবনময় অনীশকে বললেন, তোমার নামটা উচ্চারণ করতে সাহেবদের অসুবিধে হবার কথা নয়। অ্যানিস নামে এক রকম মৌরির মদ আছে, সুতরাং শব্দটা ওদের চেনা। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে যে ওদের দাঁত ভেঙে যাবে। কী বলে, ব্যান্ডো ?

অনীশ বললো, কলকাতা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটে ব্যানার্জি চ্যাটার্জি লেখে না, আসল পদবী লেখে। সেইজন্য এখানকার অফিসে ওই নামই জানে। তবে পদবী ধরে আর কে ডাকে ?

জীবনময় জিজ্ঞেস করলেন, শিখা, তোকে কী বলে রে ?

শিখা বললো, আমার নামটা কেউ বেঁকিয়ে উচ্চারণ করলে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি অফিসের সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছি, এখন তারা দিব্যি শিখা বলতে পারে।

জীবনময় বললেন, শিকাগোতে একটি বাড়িতে গিয়েছিলাম, সে বাড়ির একটি মেয়ের নাম অপরাজিতা। সবাই তাকে বলে জিটা! জিটা বা জিতা, অর্থাৎ তার নামের মানের ঠিক উল্টো!

সবাই হেসে উঠলো।

জীবনময় সেলিমের দিকে ফিরে বললেন, তোকে এ দেশের লোকেরা কী বলে ডাকবে জানিস? স্যালেম। ওই নামে একটা সিগারেট আছে।

টিনা সেলিমকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ছবি আঁকেন?

সেলিম মাথা নিচু করে বললো, জী না।

টিনা আবার জিজ্ঞেস করলো, তা হলে গান করেন?

সেলিম একই ভাবে বললো, জী না।

টিনা শিখার দিকে তাকালো।

জীবনময় বললেন, ও ছবিও আঁকে না, গানও গায় না। তবু শিল্পী ঠিকই। সেলিম আমার ছাত্র ছিল, কিন্তু মনোযোগী ছাত্র ছিল না। এম এ পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দেয়। এর আগে ও একটু আধটু থিয়েটার করতো, এই সময় হঠাৎ ঝোঁক হয় মূকাভিনয় শিখবে। প্যান্টোমাইম যাকে বলে। ঢাকাতে কার জানি অনুষ্ঠান দেখে ওর ভালো লেগেছিল। কলকাতায় গিয়েও শেখার চেষ্টা করেছে। এখন এই পৃথিবীতে প্যান্টোমাইমের রাজা হলেন মারসেল মরসো। সেতারে যেমন রবিশঙ্কর, বক্সিং-এ মহম্মদ আলি, গানে পল রবসন, এঁরা যেমন লিজেন্ডারি ফিগার, প্যান্টোমাইমে সেইরকম মারসেল মরসো।

টিনা বললো, জানি। কলকাতায় ওঁর শো দেখেছি। উনি প্যারিসে থাকেন।

জীবনময় বললেন, ঠিক। আমাদের এই সেলিম ঘটি-বাটি বিক্রি করে প্যারিস চলে এলো মারসেল মরসোর কাছে শেখার জন্য নাড়া বাঁধবে বলে। উনি আগে বাইরের এরকম কিছু কিছু ছেলেকে শিখিয়েছেন। আমাদেরই বাংলাদেশী আর একটি ছেলে পার্থ মজুমদার, জোর করে চলে এসে মারসেল মরসোর নজরে পড়ে গিয়েছিল। পার্থ এখন বেশ নামটামও করেছে, ইওরোপের অনেক জায়গায় শো করে, প্যারিসে একটা রেস্তোরাঁ চালায়। কিন্তু সেলিমের কপাল খুললো না। মারসেল মরসোর বয়েস হয়ে গেছে অনেক, তিনি আর ছাত্র নিতে রাজি নন। পার্থ অনেক চেষ্টা করেছিল সেলিমের জন্য, তবু কোনো লাভ হল না। দিনকালও পাল্টে

গেছে। ফ্রান্সে এখন ওয়ার্ক পারমিট জোগাড় করা খুবই শক্ত। ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রান্টদের ওরা ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয়। খরচ চালাবার জন্য সেলিম একটা দোকানে বে-আইনি ভাবে চাকরি করছিল, ধরা পড়ে গেছে। সেই সময় আমি প্যারিসে গিয়ে পড়লাম। পার্থ যে রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সেখানে খেতে গেছি, সেলিম আমাকে দেখে প্রায় কেঁদেই ফেললো। দেশে ওর আর কিছু নেই, ঢাকায় ফিরলে চাকরি বাকরিও সহজে পাবে না। আমি তখন বললাম, চল, আমি তোর একটা টিকিট কেটে দিচ্ছি, আমেরিকায় গিয়ে লাক ট্রাই করবি।

অনীশ জিজ্ঞেস করলো, এখানে আসবার ভিসা পেল কী করে?

জীবনময় মুচকি হেসে বললেন, সে অনেক কায়দা করে জোগাড় করা গেছে। ফ্রান্সে বসে আমেরিকান ভিসা পাওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। একদিন আমেরিকান কনসালের এক পার্টিতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। উনি এক সময় ঢাকাতে ছিলেন, তখন থেকেই ওঁকে চিনি। সেই সুবাদেই আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেখানে ওই কাণ্ড। না, অভিনয় করিনি, সত্যি সত্যি প্রেসার হঠাৎ বেড়ে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তক্ষুনি ডাক্তার ডাকা হলো। সে সাহেব জানতেন যে প্যারিস থেকে আমেরিকায় আমার তিনটে সেমিনারে যোগ দেওয়ার কথা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই অবস্থায় আমেরিকা ঘুরবেন কী করে? আমি বললাম, ঠিক পেরে যাবো, আমার মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স আছে। তবে সঙ্গে একজন অ্যাটেন্ডান্ট থাকলে ভালো হয়। তারপর সেলিমকে হাজির করলাম, ওর এক বছরের ভিসা জুটে গেল।

অনীশ বললো, সে ভিসায় তো উনি চাকরি বা ব্যবসা কিছু করতে পারবেন না।

জীবনময় বললেন, আরে, এত বড় দেশ, একবার ঢুকে পড়লে কে কার খবর রাখে? কম মাইনের কাজ করতে রাজি হলে অনেকেই বে-আইনী চাকরি দেয়। এরকম এ দেশে কত আছে, তাই না?

অনীশ বললো, তা আছে, কিন্তু বেশ রিস্কি।

জীবনময় বললেন, খানিকটা ঝুঁকি তো ওকে নিতেই হবে। ওর হারাবার কিছু নেই। মা নেই ছেলেটার, দ্বিতীয় মা ওকে দেখতে পারে না। বাবার সঙ্গেও সম্ভাব নেই। ফিরে গেলে বাড়িতে থাকতে দেবে কিনা সন্দেহ।

শিখা জিজ্ঞেস করলো, ওঁর তো চেহারা বেশ ভালো। উনি বাংলা

granthagar.weebly.com

সিনেমায় নামলেন না কেন ?

জীবনময় বললেন, সিনেমায় অভিনয় আর প্যান্টোমাইম কি এক হলো ? আমাদের সেলিম মূকাভিনয়ের শিল্পী। দেখছো না, কেমন মুখ বুজে বসে আছে।

সেলিম আগাগোড়াই বসে রয়েছে মাটির দিকে চেয়ে।

টিনা বললো, আজ তো সন্ধেবেলা কয়েকজন লোক আসবে আমাদের বাড়িতে। উনি তখন প্যান্টোমাইম দেখাবেন।

জীবনময় বললেন, সেটা খুব ভালো কথা। এখানেই ওর একটা শো হয়ে যাক। আমেরিকায় প্রথম শো। এই হুজুগের দেশে যদি একবার নাম করে ফেলতে পারে, তা হলে কোটিপতি হয়ে যাবে। কারা আসবে আজ সন্ধেবেলা ?

শিখা বললো, তুমি আসছো শুনে অনেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সবাইকে তো ডাকা সম্ভব নয়, সাত-আটটি ফ্যামিলিকে আসতে বলেছি।

জীবনময় বললেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কেন, আমি কি বিখ্যাত লোক নাকি ?

শিখা বললো, বাঃ, তুমি ফেমাস নও ? আমেরিকা থেকে এতবার তোমাকে ইনভাইট করে।

granthagar.weebly.com

জীবনময় প্রাণ খুলে হাসলেন।

তারপর বললেন, আজকাল একটা নতুন রোগ বেরিয়েছে, তার নাম সেমিনারাইটিস। খালি সেমিনার, খালি সেমিনার ! শুধু কথার ফুলঝুরি। অর্থনীতি নিয়ে সেমিনার বেশি হয় ! হুঁঃ। আমাদের মতন গরিব দেশের আবার অর্থনীতি। অর্থই নেই, তার অর্থনীতি। আমি আসি কেন জানিস, এরা ভালো মন্দ খাওয়ায়, সেইজন্য। আমি নিশ্চিত জানি, তোদের এই সেন্ট হেলেন শহরের কোনো বাঙালী আমার নামও শোনেনি !

অনীশ বললো, আপনার ভাগ্নী আপনাকে নিয়ে খুব গর্বিত।

জীবনময় বললেন, ভাগ্নে-ভাগ্নী থাকার এই সুবিধে। তারা মামাদের নামে ঢাক পেটায়।

অনীশ বললো, মামাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? কিছু মনে করবেন না ? আপনি ড্রিংক করেন ?

—নাঃ।

—বীয়ার টিয়ারও চলে না ?

—আমাকে বেরসিক বলতে পারো। অ্যালকোহল কখনো

ছুঁইনি।

—তা হলে, মানে, সন্ধেবেলা আমাদের যে বন্ধু-বান্ধবরা আসবে, তারা তো অনেকেই ড্রিংক করে। আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

শিখা চোখ দিয়ে অনীশকে চুপ করিয়ে দিতে চাইলো।

অনীশ বললো, বাঃ, ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো নয়? দীপেন, প্রিয়ব্রতরা এসেই তো বোতল বার করতে বলবে।

জীবনময় বললেন, কোনো অসুবিধে নেই। মদের বোতল দেখলেই আমার জাত যাবে না। তোমার বন্ধুদের অস্বস্তির কোনো কারণ নেই। তবে সেলিম আমার ছাত্র, ও ড্রিংক করে কি না আমি জানি না, আমার সামনে ওর ড্রিংকিং অ্যালাউ করবো না।

এতক্ষণ বাদে সেলিম বললো, না, না, না, না।

টিনার হাসি এসে গেছে, সে মুখে হাত চাপা দিল।

চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়িয়ে সেলিম বললো, আমি একবার ঘরে যাই?

টেলিফোন বাজতেই অনীশও উঠে গেল। টিনা গেল বাথরুমে। ব্রেক ফাস্ট টেবলের আড্ডা শেষ।

granthagar.weebly.com

জীবনময় এখনো বসে আছেন। শিখার সঙ্গে টুকটাক পারিবারিক কথা বলতে লাগলেন।

শিখা এক সময় জিজ্ঞেস করলো, জীবনমামা, তুমি সত্যিই প্যারিসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে?

—সত্যি নাকি মিথ্যে বলবো তোদের? না, অভিনয় করিনি, সত্যিই মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। এরকম আগেও হয়েছে কয়েকবার। হার্টে বোধহয় ফুটো টুটো হয়ে গেছে।

—সেকি? তুমি চিকিৎসা করাওনি? এই রকম ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছো?

—চিকিৎসা করালেই বা কী হবে? এক এক ডাক্তার এক এক রকম কথা বলে।

—না, না, ওরকম নেগলেক্ট করলে চলবে না। এ দেশে ভালো করে দেখিয়ে যাও। আমাদের চেনা ডাক্তার আছে।

—দ্যাখ, তোরা এ দেশে অসুখ নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করিস। আমেরিকায় প্রায় সকলেরই অসুখ অসুখ বাতিক! মানুষের বয়েস হলে দুটো-একটা অসুখ তো হবেই। ওষুধ দিয়ে বড়জোর জোড়াতালি লাগানো যায়।

—যাই বলো, এ দেশে এরা কতকগুলো স্বাস্থ্যের নিয়ম মানে। রেগুলার চেকআপ করায়।

—আমাদের দেশগুলোকে এরা এমন অস্বাস্থ্যকর মনে করে, যেন সেখানে মানুষের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দেশেও কি অনেক লোক সত্তর-আশি বছর বাঁচে না। অনেক চাষা ভুষোকেও দেখেছি, জীবনে কোনো ওষুধ না খেয়েও আশি বছর পর্যন্ত দিব্যি চলে-ফিরে বেড়ায়।

শিখা তবু একথাটা মানলো না। মনে মনে সে ঠিক করে ফেললো, ডাক্তার জ্যাকেরিয়াকে একবার আলাদা করে ডাকতে হবে।

সারা দুপুর প্রায় ঘুমিয়েই কাটালেন জীবনময়। সেলিম বসবার ঘরে টি ভি দেখলো ঘন্টার পর ঘন্টা।

সন্ধেবেলা জীবনময় যখন বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন, তখনো তিনি পরে আছেন লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি।

শিখা বললো, জীবনমামা, তুমি জামা-টামা পাল্টাবে না?

জীবনময় অবাক হয়ে বললেন, কেন, সেজেগুজে থাকতে হবে নাকি? বাড়ির মধ্যে তো আমি কোট-প্যান্টুল পরি না, এই রকমই থাকি।

শিখা বললো, বাইরের লোকজন আসবে তো!

অনীশ বললো, না, না, এই ঠিক আছে। ফর্মালিটির কিছু নেই।

শিখা তবু খুঁত খুঁত করতে লাগলো। আর তো কেউ নয়, ভয় শুধু বাসবীকে নিয়ে। বাসবী বিশ্বনিন্দুক। শিখার মামা লোকজনের মাঝখানে লুঙ্গি পরে বসে থাকে, একথা সে সবাইকে বলে বেড়াবে। একদিন সে বলেছিল, মেয়েদের সামনে পুরুষদের লুঙ্গি পরে থাকাটা চূড়ান্ত অসভ্যতা। মেয়েরা কি পুরুষদের সামনে শুধু শায়া পরে আসে?

টিনা দুপুরে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে গেছে, এখনো ফেরেনি। অনীশ টিনাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ডাউন টাউনে, ফেরার কথা অন্য একজনের সঙ্গে। বাড়িতে এত লোকজন আসবে, টিনা না থাকলে শিখা একা সামলাবে কী করে?

অনীশ বললো, মামাবাবু, একটু উঠুন, সোফাগুলো দেয়ালের এক ধারে সরিয়ে দিই। কয়েকজনকে কার্পেটে বসতে হবে, নইলে এত লোকের জায়গা হবে না।

জীবনময় বললেন, সে-ই ভালো। সেলিম যখন প্যান্টোমাইম দেখাবে, তার জন্যও একটা দিক ফাঁকা রাখা দরকার।

granthagar.weebly.com

সেলিম অনীশকে সাহায্য করলো সোফাগুলি সরাতে। একটা সাদা প্যান্টের ওপর জমকালো কাজ করা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আছে সে, পায়ে রেশমি ফুল বসানো স্যান্ডেল। তাকে একজন ফিলমের অভিনেতার মতনই মনে হয়।

প্রথমে এলো চক্রবর্তী দম্পতি। পুরুষটিকে দেখতে ভালোমানুষ দৈত্যের মতন, আর রমণীটি যেন ফুলপরী।

পুরুষটি ঢুকেই অনীশকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যানার্জি, বাইরে যে ক্যাডিলাক গাড়িটা দেখলাম, ওটা কার ?

রমণীটি বললো, বাঃ, শিখা এ গাড়িটা চালিয়ে বান্টির বার্থ ডে পার্টিতে এসেছিল, তুমি তখন দেখোনি ?

পুরুষটি বললো, রিয়েলি ? না, লক্ষ করিনি। কবে কিনলেন ?

অনীশ বললো, গত মাসে। ফোর্ডটা বিক্রি করে দিলাম।

পুরুষটি বললো, কেন মশাই, ফোর্ডটা হাতছাড়া করলেন ? ওটা আমি একবার চালিয়েছি। ইট ওয়াজ আ গুড কার। হার্ডি, রিলায়েবল !

অনীশ বললো, মাঝে মাঝে স্টার্ট নিতে গণ্ডগোল করতো। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি শিখার মামা জীবনময় মিত্র, বিখ্যাত ইকোনমিস্ট। আর ইনি আর একজন গেস্ট, মিঃ সেলিম জাফর, একজন আর্টিস্ট।

granthagar.weebly.com

পুরুষটি বললো, নমস্কার। আমার নাম চারুপ্রকাশ চক্রবর্তী, আর ইনি আমার স্ত্রী অনীতা—

অতিথি দু'জনের প্রতি আর বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে চারুপ্রকাশ আবার অনীশের দিকে ফিরে বললো, এই লেটেস্ট মডেলের ক্যাডিলাকে কি সীট গরম করার ব্যবস্থা আছে ? এই ঠাণ্ডার দিনে মশাই সকালবেলা গাড়িটা খুলে প্রথম বসলেই ইউ গেট আ শক ইন ইউর অ্যাস্। রংটা সাদা নিলেন কেন ?

চারুচন্দ্রের গাড়ির বাতিক। সে ও ছাড়া কোনো বিষয়ে কথা বলা পছন্দ করে না।

অনীতা মিষ্টি হেসে সেলিমকে জিজ্ঞেস করলো, আপনিও কি দেশ থেকে আসছেন, না এখানেই থাকেন ?

সেলিম কিছু জবাব দেবার আগেই জীবনময় বললেন, ও আসছে প্যারিস থেকে।

অনীতার মুখে একটা সম্ভ্রমের ছাপ দেখা দিল। প্যারিস ! আজও দেখা হয়নি ! প্রত্যেকবার সরাসরি দেশে চলে যাওয়া হয়, নামা হয় না

ইওরোপের কোথাও। চারুপ্রকাশ একটি ডলারও অকারণ বেড়াবার জন্য খরচ করতে চায় না।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, প্যারিসে আপনি কী করেন?

এবারেও সেলিমের বদলে জীবনময় বললেন, ও প্যারিসে ছাত্র ছিল!

তারপর হেসে বললেন, আপনি বোধহয় ভাবছেন ছেলেটি বোবা কি না। তা নয়। ও একজন মূকাভিনয় শিল্পী। একটু বাদেই আপনাদের মূকাভিনয় দেখাবে। তার আগে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে হয়, না হলে ঠিক মুড আসে না।

মূকাভিনয় ব্যাপারটা কী, তা বুঝলোই না অনীতা। শক্ত বাংলা সে বোঝে না।

আস্তে আস্তে অন্য অতিথিরা আসতে লাগলো।

এদের একটা ছোট বৃত্ত আছে। এই বৃহৎ পৃথিবীতেও মানুষ ছোট বৃত্তই পছন্দ করে। সাত-আটটি পরিবারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন হয়। যারা যারা শিখা-অনীশদের নেমন্তন্ন করে, তাদেরই আজ ওরা ডেকেছে। অবাঙালি পরিবার একটিও নেই, ভারতীয়রা অন্য রাজ্যের ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেশে না, তা হলে যে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে। এমনকি পশ্চিমবাংলার বাঙালি ও বাংলাদেশীদের মধ্যেও তেমন যোগাযোগ নেই। মুখ চেনা আছে, শপিং মলে দেখা হলে কথা হয়, কিন্তু বাড়িতে যাতায়াত হয় ক্বচিৎ কদাচিৎ! পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের দুর্গাপূজার উৎসবে বাংলাদেশীরা আসে না, আবার ওদের নববর্ষের উৎসবে যোগ দেবার সময় পায় না পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা। একবার দুই বাংলার বাঙালিরা একসঙ্গে মিলে বড় করে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাও ভেস্তে গেল।

শিখাদের বাড়িতে অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। প্রণবেশের স্ত্রী আমেরিকান। সাত বছর বিয়ে হয়েছে, তবু সে সাতটির বেশি বাংলা শব্দ বোঝে না। আড্ডার মধ্যে তাকে নিয়ে খুব অস্বস্তি হয়। বাংলা রসিকতা শুনে সবাই যখন হাসে, তখন সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বাংলা রসিকতা আর একবার ইংরিজিতে অনুবাদ করলে বিকট শোনায়। প্রণবেশ তবু সেই চেষ্টা করবেই।

প্রণবেশকে অনেক সময় আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানো হয়, যাতে এইসব আড্ডাতে সে বউকে না আনে। কিন্তু প্রণবেশ তা কিছুতেই বুঝবে না। আমেরিকানরা কোনো পার্টিতে যদি কেউ স্ত্রীকে সঙ্গে

granthagar.weebly.com

নিয়ে না যায়, তা হলেই অন্যরা ধরে নেয়, স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ আসন্ন।

সামসুল আলম বাংলাদেশ থেকে এলেও সমস্ত বাঙালিদের আসরে তাঁর অবাধ গতি। মোটাসোটা দিল দরিয়া মানুষ, তিনিই বাংলাদেশী ও পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। তিনি টেলিফোনে সকলের খবর নেন, সবাই যে-কোনো নেমন্তন্নে তাঁকে বাড়িতে ডাকে। তাঁর স্ত্রীকে সকলেই ডাকে হাসিনা মাসি, তাঁর রান্নার হাত অপূর্ব। কোনো বাড়িতে গেলেই তিনি একটা কিছু রান্না করে আনেন, আজ যেমন এনেছেন বড়ি দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল। কী করে তিনি এই সব মাছ জোগাড় করেন, সেটা একটা বিস্ময়।

জীবনময় ও সেলিমের সঙ্গে সকলের আলাপ হলো বটে, কিন্তু কেউই ওদের কাছ ঘেঁষলো না। আনুষ্ঠানিক নমস্কার জানাবার পরই সবাই নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কে বাড়ি বদলাচ্ছে, কে নতুন গাড়ি কিনছে, কার বিয়ে ভাঙবার মুখে, কোন দোকানে পারফিউম শস্তা। আগন্তুক দু'জন সম্পর্কে অন্যদের আগ্রহ নেই। দেশের খবরও জানতে চায় না, আজকাল নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা আসে, সব খবরই জানা যায়।

জীবনময় আর সেলিম দু'জনে পাশাপাশি বসে মৃদু স্বরে কথা বলতে লাগলেন।

স্কচ, জিন ও রেড ওয়াইনের গেলাস নিয়েছে যে যার পছন্দমতন, জীবনময় ও সেলিম নিয়েছে কোক। টিনা এর মধ্যে কখন ফিরে এসে চট করে পোশাক বদলে শাড়ি পরেছে। হেমাঙ্গ তাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে শুরু করেছে একটানা প্রশংসাবাদ। আর কারুকে সে টিনার কাছ ঘেঁষতে দেবে না।

শিখা যাকে ভয় পায়, সেই বাসবী এসেছে দারুণ সেজেগুজে। তার মুখখানা যেন কুমোরটুলির শিল্পীদের আঁকা। তার অঙ্গে গুজরাতি ঘরচোলা শাড়ি, যার দাম ডলারের হিসেবেই হাজার খানেক। তার স্বামী দাঁতের ডাক্তার, এখানকার সব বাঙালির চেয়ে উপার্জন বেশি, তাই বাসবীর মুখে একটা গর্বের ছাপ।

শিখা কিচেনে এসে স্ন্যাক্স সাজাচ্ছে, বাসবী এসে তার পাশে দাঁড়ালো। নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলো, এ ভদ্রলোক তোর নিজের মামা?

শিখা বললো, হ্যাঁ। আমার মায়ের ঠিক পরের ভাই।

বাসবী বললো, ও।

ও-টা সে অনেকটা টানলো। তাতেই বোঝা গেল, শিখার এই মামা সম্পর্কে সে অনেক কথা ছড়াবে।

আর দু' একটা কথার পর বাসবী বললো, রবিবার তো আমাদের পাড়ার সব দোকান বন্ধ থাকে। ডাউন টাউনে এ অ্যান্ড পি প্রত্যেকদিন খোলা। ওখানে কয়েকটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম দুপুরবেলা। কেনটাকি ফ্রাই-এর দোকানের সামনে একটা গাড়িতে অনীশকে দেখলাম। সঙ্গে কে ছিল, টিনা?

শিখার শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। বাসবী ঠারে ঠোরে বলবার চেষ্টা করে, অনীশের সঙ্গে টিনার গোপন প্রেম চলছে। চঞ্চল মজুমদার নামে আগে একজন ছিল এই শহরে, বাড়িতে তার স্ত্রী ও শ্যালিকা থাকতো। শ্যালিকার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে সে একদিন বিশ্রী অবস্থায় ধরা পড়ে, তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে যায়, তা নিয়ে কেলেঙ্কারির এক শেষ। তারপর ওরা এই শহর ছেড়েই চলে গেছে। সেই চঞ্চল মজুমদারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বাসবী বারবার সাবধান করে দিতে চায় শিখাকে।

কিন্তু শিখা তার স্বামীকে চেনে না? অনীশের সব ব্যবহারই সোজাসুজি। বাড়িতে আর একটা ছেলে থাকলে তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতো, টিনার সঙ্গে অনীশের ব্যবহারও সেই রকম, নারী হিসেবে টিনাকে সে আলাদা কোনো মনোযোগ দেয় না।

শিখা বললো, হ্যাঁ, টিনার একটা নেমন্তন্ন ছিল, ওকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল অনীশ। আহা, বেচারা যদি শ্যালিকার সঙ্গে একটু প্রেম ট্রেমও করতে চায়, তুই এত নজর দিচ্ছিস কেন রে বাসবী?

এই সময় হাসিনা মাসি এসে শিখাকে স্বস্তি দিলেন। তিনি বললেন তোমরা কিচেনে বসে কী করছো? ও শিখা, আমি তোমাকে সাহায্য করি? স্যালাড বানানো হয়েছে?

এই সব রান্নাবান্নার কথা বাসবী একেবারে পছন্দ করে না, সে চলে গেল অন্যদের কাছে।

আলম সাহেব প্রথমে তাড়াতাড়ি দু'বার স্কচ নিয়ে শটাশট পান করে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে নেন। তারপর ঘুরে ঘুরে কথা বলেন সবার সঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি এলেন জীবনময়ের কাছে। অমায়িক ভাবে বললেন, আপনি যে একেবারে চুপচাপ বসে আছেন? এটি কে, আপনার ছেলে নাকি?

জীবনময় বললেন, সেলিম আমার ছাত্র। তা ছাত্ররা তো সব ছেলেরই মতন।

granthagar.weebly.com

আলম বললেন, দূর থেকে আপনাকে দেখে মনে হয় যেন লুঙ্গিপরা, দাড়িওয়ালা এক মৌলবী সাহেব !

জীবনময় বললেন, যে-দেশে থাকি, সে-দেশের পোশাক-আশাক, খাদ্যের খানিকটা প্রভাব তো পড়বেই। এ দেশে যেমন বাঙালিরাও স্লিপিং সুট পরে ঘুমায়। তবে, পার্টিশানের আগেও, আমার বাবা বাড়িতে লুঙ্গিই পরতেন।

—বাড়ি কোথায় ছিল ?

—টাঙ্গাইল।

—আমাগো বাড়ি পাবনায়। আমার আব্বাকে দেখেছি, বাইরে যাবার সময় ধুতি পরতেন। ধুতি-পাঞ্জাবিই ছিল ভদ্র পোশাক। ইদানীং বাংলাদেশে গিয়ে দেখি, মোসলমানরা কেউ আর ধুতি পরে না। ধুতি এখন হিন্দুদের পোশাক হইয়ে গেছে।

—এক এক সময় এক একরকম ঝোঁক আসে ! হিন্দুরাও এখন ধুতি পরে না তেমন।

—জিয়াউর রহমান গিয়া তো এরশাদ সাহেব পাওয়ারে আসলেন। কী বুঝছেন, দেশের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে ?

—এখনো বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

gronthagar.weebly.com

—আওয়ামি লীগের মধ্যে নাকি দলাদলি রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে ?

জীবনময় সতর্ক হয়ে গেলেন। অতি ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডল ছাড়া তিনি রাজনীতি বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। মাইনরিটি কমিউনিটি হবার অনেক জ্বালা। যে-কোনো আলটপকা মন্তব্যের অন্যরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। ইন্ডিয়াতেও সংখ্যাগুরু হিন্দুরা ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে যা-খুশি বলতে পারে, মুসলমানরা কি তা বলতে সাহস করে ?

কথা ঘোরাবার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কতদিন এসেছেন ?

আলম বললেন, চব্বিশ-পঁচিশ বছর হবে। আই লস্ট কাউন্ট ! জানেন মিত্রবাবু, আমি সবাইরে বুঝাবার চেষ্টা করি যে আমরা যারা বাংলায় কথা বলি, আমরা সবাই বাঙালি। দুইটা আলাদা দেশ হোক না। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে দেখি যে আমরা হয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশী, আর এই অনীশ-হেমাঙ্গরা বাঙালি ! এ কেমনতর কথা !

দূর থেকে হেমাঙ্গ বললো, আপনারা বাংলাদেশ নামটা নিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা বাঙালি পরিচয় ছাড়বো কেন ? আমরা চোদ্দ পুরুষ বাঙালি।

আলম বললেন, আগেকার দিনে কলকাতায় হিন্দুরা বলতো, ওই লোকটা মুসলমান, না বাঙালি? কারণ, কলকাতায় মুসলমানরা অনেকেই উর্দুতে কথা বলতো। কিন্তু আমরা এপারের মুসলমানরা বাংলা ভাষার জন্য কত লড়াই করলাম, কত রক্ত দিলাম, তবু মুসলমানরা বাঙালি হলো না? বাংলাদেশী হয়ে যাবে।

হেমাঙ্গ বললো, যারা বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করেছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তারা আজ কোথায়? এখনকার বাংলাদেশে তো তারা আর পাত্তাই পায় না। আপনাদের এরশাদ সাহেব কি মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিলেন? জিয়াউর রহমানও তো মুক্তিযোদ্ধাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনময় আস্তে আস্তে আপনমনে বললেন, রেভোলিউশান ডিভাউরস ইটস ওউন চিলড্রেন!

অনীশ উঠে দাঁড়িয়ে জোরে হাততালি দিয়ে বললো, একটি ঘোষণা আছে। প্লিজ সবাই একটু চুপ করুন। আমাদের এখানে একজন গেস্ট আছেন, তিনি প্যান্টোমাইম আর্টিস্ট। তিনি এখন আপনাদের প্যান্টোমাইম অর্থাৎ মূকাভিনয় দেখাবেন। কাল সোমবার, সকলেরই অফিস আছে, বেশি রাত করা যাবে না।

gronthagar.weebly.com

জীবনময় বললেন, কিন্তু ওর যে আর একটু সময় লাগবে, মেক আপ নিতে হবে। যা সেলিম চট করে সেজে আয়।

মিনিট পনেরোর মধ্যে সেলিম একেবারে অন্যরকম রূপ ধরে এলো।

মুখে সাদা রং মাখা, গায়ে সাদা গেঞ্জি, আর একটা থ্রি কোয়ার্টার চাপা প্যান্ট, সেটাও সাদা। হাতে কয়েকটা পোস্টার।

সবাই একদিকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। জীবনময় একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে মারসেল মরসোর ভাবশিষ্য, উদীয়মান শিল্পী সেলিম জাফরের পরিচয় করালেন। তাঁর বক্তৃতায় একটা অনুরোধের সুর রইলো, যাতে সেলিমের জন্য একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানগুলির কোনো মৌখিক পরিচিতি নেই। এক একটা পোস্টারে এক এক রকম লেখা। প্রথমটি : ঢাকার সাইকেল রিক্সা ও এক মহিলা যাত্রী।

নিঃশব্দে, শুধু মুখভঙ্গি দিয়ে সেলিম একবার রিক্সাচালক, একবার মহিলা যাত্রী, ওদের দরাদরি, তারপর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রিক্সা ছোটানো, সামনে গরু ইত্যাদি ফোটাতে লাগলো।

সবাই বলতে লাগলো, দারুণ তো, হাউ নাইস, কী চমৎকার এক্সপ্রেশন, ওমা, কী মজার ইত্যাদি। প্রণবেশের মেম বউয়েরও উপভোগ করতে অসুবিধে হলো না।

দ্বিতীয়টি : স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। অবিকল ঝগড়াটি মেয়েদের মতন মাথা ঝাঁকানোটা সেলিম বেশ রপ্ত করেছে। সবাই হাসলো দেখে।

তৃতীয়টি : অফিসের বড়বাবু ও ভিতু কর্মচারী।

এর মধ্যেই দর্শকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কথা বলতে শুরু করেছে নিজেদের মধ্যে।

বাসবী উঠে গিয়ে কিচেনে শিখাকে বললো, যাই বলিস, একটু বোরিং। আমাদের খাবার দিয়ে দে। বাচ্চাদের রেখে এসেছি।

সেলিম যখন পঞ্চম অনুষ্ঠানটি দেখাচ্ছে তখন ঘর প্রায় ফাঁকা। অন্যরা কিচেনে খাবার নেবার জন্য লাইন দিয়েছে, সেলিমের দর্শক মাত্র তিনজন, জীবনময়, আলম আর টিনা। সম্ভবত হেমাঙ্গকে এড়াবার জন্যই টিনা এখন রান্নাঘরে যেতে চায় না, সে দেখছে বেশ মনোযোগ দিয়ে।

এক সময় জীবনময় বললেন, যাক, যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার নেই, সেলিম!

আলম সাহেব বললেন, বাঃ, বেশ ভালো লাগলো। আমি আগে এটা দেখি নাই। প্যান্টোমাইম! নতুন জিনিস!

টিনা কাছে এগিয়ে এসে সেলিমকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আপনার পোস্টারে যা যা লেখা আছে, তার বাইরে কিছু, মানে আমরা যদি কিছু রিকোয়েস্ট করি, সেটা দেখাতে পারেন?

সেলিমের মুখ এখন নিরেট সাদা। গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেছে। এ খেলায় পরিশ্রম আছে।

সে বললো, জী না, যেগুলি দেখালাম, তা আগে অনেকবার প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। আমি এখনো ভালো শিখি নাই। তবে, মূকাভিনয়ে সব কিছুই দেখানো যায়।

টিনা আবার জিজ্ঞেস করলো, সব কিছু দেখানো যায়? নিজেকে দেখানো যায়? এতক্ষণ যা দেখালেন, সবই তো অন্যের নকল। কেউ তার নিজের চরিত্রটা মূকাভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে?

সেলিম এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর খুঁজে পেল না।

granthagar.weebly.com

॥ ৩ ॥

অতিথি এলে প্রধান সমস্যা সোমবারটাকে নিয়ে।

এ দেশে যখন তখন ছুটি নেওয়া যায় না। ছুটি না নিয়ে অফিস ডুব দেবার প্রশ্নই ওঠে না। অফিসে হাজিরা দেওয়ার চেয়েও নিজের কাজের দায়িত্বই বড় কথা। শনি-রবি এই দু'দিন ছুটির পর সোমবার যেতেই হয়।

সোমবার অতিথিরা কী করবে?

মিকি যাবে স্কুলে, টিনা ইউনিভার্সিটিতে, শিখা আর অনীশ অফিসে। দেশ থেকে যারা আসে, তারা তো প্রায় অনেকেই গ্যাস জ্বালিয়ে চা করে নিতেও জানে না। এঁদের হাতে কিচেনটা ছেড়ে দিতে ভরসাও হয় না।

তাছাড়া, অতিথিরা কি সারাদিন বাড়িতে বসে থাকবে? কাছাকাছি কোনো বাসস্টপ নেই। টিউব স্টেশান পাঁচ মাইল দূরে। কেউ একবার চিনিয়ে না দিলে প্রথম এসেই টিউব ট্রেনে যাতায়াত সহজ নয়। শিখা অফিসে চেষ্টা করেছিল, একমাত্র সে ছুটি পেতে পারে বুধবার। অনীশের ছুটি নেবার প্রশ্নই নেই। সে কাজ পাগল। তাছাড়া, দেশ থেকে কেউ এলেই তাকে গাড়ি নিয়ে ঘোরানোতে অনীশের ঘোর আপত্তি। মাত্র তো দুটো-তিনটে দেখবার জায়গা, সেখানে কতবার যাবে সে?

অগতির গতি হেমাঙ্গ। তার সেল্‌স-এর চাকরি, নির্দিষ্ট সময় অফিসে বসতে হয় না। সে দু-এক ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে। কাল রাত্তিরে তাকে অনুরোধ করা হয়েছে, সে শিখার মামাবাবুদের দু-একটা জায়গা ঘুরিয়ে দেবে।

অনীশকে বেরুতে হয় সবচেয়ে আগে। সে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। তারপর শিখা বেরোয় ঠিক আটটায়। টিনার সহপাঠী একটি চীনা ছেলে থাকে এ পাড়ায়, সে সাড়ে নটার সময় টিনাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়, সেজন্য অবশ্য তেলের দাম শেয়ার করতে হয় তাকে।

কাল রাতে পার্টি ভাঙতে ভাঙতে সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল, শুতে শুতে একটা। সেলিম ঘুমিয়েছে বসবার ঘরের সোফা-কাম-বেডে, খুব ভোরে সে অন্যদের পায়ের আওয়াজ পেয়েই উঠে পড়েছে। শিখার ভালো করে ঘুমই হয়নি, ভোর পাঁচটাতেই উঠে সে ব্রেকফাস্টের জিনিসপত্তর সাজিয়েছে, স্বামীকে চা করে

granthagar.weebly.com

দিয়েছে, ছেলের টিফিন দিয়েছে। আটটার সময়ও মামাবাবুর ঘুম ভাঙলো না দেখে সে টিনাকে বলে গেল ব্রেকফাস্ট তৈরি করে দিতে।

রবিবার ছাড়া এ বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না। যে-যার অফিসে কাগজ দেখে নেয়, তাছাড়া টিভি-তেই তো সব খবর থাকে।

টিনা বেসমেন্টে। সেলিম তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার করার কিছুই নেই, টিভি-টা চালাতেও সাহস পাচ্ছে না। প্যারিসে তবু বেশ কয়েকজনের সঙ্গে চেনাশুনো হয়েছিল, এখানে একেবারে অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে পড়েছে।

কাল সে জীবনময়ের সামনে সিগারেট ধরায়নি, লুকিয়ে বাথরুমে দুটো খেয়েছিল, এখন সে একটার পর একটা সিগারেট টানছে। বাড়ি থেকে যে একটু বেরুবে, তার উপায় নেই, দরজায় ইয়েল লক, ফেরার সময় তাকে দরজা খুলে দেবে কে? এই আমেরিকা? জীবনময়ের সঙ্গে সে নিউইয়র্কের হোটেলে কাটিয়েছে দু'দিন, কিছুই দেখা হয়নি, তারপর একদিন এখানে। সে কিছুতেই দেশে ফিরবে না। এখানেই লড়াই করে একটা জায়গা করে নিতে হবে! ঢাকায় তার সম্বল কিছুই নেই, বাবা তাকে সাহায্য করবে না, ভদ্রগোছের একটা চাকরি জোটানোও অসম্ভব। কত ছেলেই তো আমেরিকায় এসে ভাগ্য ফিরিয়েছে!

granthagar.weebly.com

বেসমেন্ট থেকে উঠে এলো টিনা। জিন্‌স পরা, পায়ের কাছে একটু গুটোনো, ওপরে হলুদ স্পোর্টস শার্ট, তার সুগোল স্তন দুটি একেবারে স্পষ্ট, চুল এলোমেলো, এটাই ওদের ক্যাম্পাসের এখনকার স্টাইল।

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে টিনা নাক কুঁচকোলো। সে ঘোরতর ধূমপান বিরোধী। এ বাড়িতে একমাত্র শিখা ছাড়া আর কেউ সিগারেট খায় না, অনীশ এক বছর আগে ছেড়ে দিয়েছে। অনীশ আর টিনা মিলে শিখার পেছনে লেগেও তার সারাদিনে পাঁচটা সিগারেট ছাড়াতে পারছে না।

টিনা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন চা খাবেন?

সেলিম বললো, আগে স্যার উঠুন, তারপর একসঙ্গে খাবো। টিনা ঘড়ি দেখলো। সাড়ে আটটা। মামাবাবু যদি আরও দেরি করেন, তা হলে তাঁকে ডাকতেই হবে। উনি বেড়াতে এসেছেন, বেলা করে ঘুমোতেই পারেন, কিন্তু টিনা তো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না।

সে বসবার ঘরের টিভি চালিয়ে দিয়ে এক কোণে বসলো। প্রত্যেক দিন এই সময় সে দশ মিনিট টিভি দেখে। তার হাতে একটা বই। কখনো টিভি-র দিকে চোখ, কখনো বইয়ের দিকে। অন্যান্য দিন এই সময়ে সে বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকে।

এক সময় সে লক্ষ করলো, সেলিম সোফায় বসে টিভি না দেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে টিনা হাসলো।

সেলিম বললো, আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, সেখানে আমি ভর্তি হতে পারি না ?

—কী পড়বেন ?

—ইংলিশ। আমাকে ভালো করে ইংলিশ শিখতে হবে।

—স্টুডেন্ট ভিসা না থাকলে আপনাকে কেউ ভর্তি করবে না। টাকা পয়সার প্রশ্ন তো আছে। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে কিছু করতে গেলেই আপনাকে সোজাসুজি ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

—অনেকেই তো এরকম আসে !

—তাদের কথা আমি জানি না।

টিনা উঠে পড়ে বললো, আমি খাতাপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি। মিনিট পনেরো পর এসে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করবো।

granthagar.weebly.com

টিনা আবার ফিরে গেল বেসমেন্টে। ঠিক পনেরো মিনিট পরে ফিরে এসে সে অবাক হলো।

জীবনময় এর মধ্যে উঠে কফি বানিয়ে নিয়েছেন। তাঁর আর সেলিমের হাতে কফির কাপ।

টিনা বললো, মামাবাবু, আপনি নিজে কফি বানালেন ? আমাকে ডাকলেই তো পারতেন !

জীবনময় বললেন, সবাই ভুলে যায় যে আমি ছাত্র জীবনে তিন বছর ইংল্যান্ডে ছিলাম। তখন নিজে রান্না করে খাইনি ? ঢাকাতেও আমি প্রায়ই নিজে রান্না করি।

—মামাবাবু, ব্রেকফাস্টে কী খাবেন ? কর্নফ্লেকস ? টোস্টের সঙ্গে সসেজ কিংবা হট ডগ ? হ্যামবার্গারও বানিয়ে দিতে পারি। কিংবা যদি ডিম চান।

—তুই তিন মাসেই অনেক কিছু শিখে গেছিস তো ! হ্যামবার্গার বানাতে পারিস !

—কলকাতাতেও অনেকে হ্যামবার্গার খায়। এমনকি নিরামিষ হ্যামবার্গারও পাওয়া যায় মাড়োয়ারি ছেলেদের জন্য !

—নিরামিষ হ্যামবার্গার ! কাঁঠালের আমসত্ত্ব ! বীফ ছাড়া

হ্যামবার্গারের কথা শুনলে হামবুর্গের লোকেরা অজ্ঞান হয়ে যাবে। না রে, আমার ওসব কিছু চাই না। ওই যে কলা রয়েছে দেখছি ফ্রিজের ওপর। কলা আর দুধ দিয়ে কর্নফ্লেকস খাবো, আর কিছু না। সেলিম কী খাবে জিজ্ঞেস কর।

—আমিও তাই।

—হ্যাঁরে তৃণা, তুই তো জবর সেজেছিস। তোকে এই পোশাকে দেখলে কেউ ইন্ডিয়ান বলে চিনতে পারে? তোকে তো কালো দেশের লোক বলে মনেই হয় না। স্প্যানিশ বলে অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়।

—স্প্যানিশ না ছাই! আমেরিকানদের চোখে আমরা সবাই কালো।

—আমাদের সেলিম! ও তো একেবারে গৌরবর্ণ!

—ওকেও কালো বলবে। বড়জোর বলবে টার্কিস! বসফোরাসের ওপারে সবাই কালো।

—লোকের চোখে যেমন ন্যাবা হয়, তেমনি সাহেবদের চোখের পর্দাতেও কিছু দোষ আছে। সেলিমের তুলনায় অনেক আমেরিকানদেরই তো আমাদের কম ফর্সা মনে হয়।

—আমরা যখন অনেক টাকা রোজগার করবো, তখন আমেরিকানদের ক্যাটকেটে বিশ্রী সাদা বলবো! কিংবা লাল মুখো!

জীবনময় হা-হা করে হেসে উঠলেন।

তখনই এসে উপস্থিত হলো হেমাঙ্গ।

প্রথমেই সে টিনাকে বললো, হাই গর্জাস! ইউ হ্যাভ ড্রেস্ড টু কিল! হু ইজ দা লাকি গাই?

তারপর জীবনময়ের দিকে ফিরে বিনীত ভাবে বললো, মামাবাবু, কাল আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি। আমি এইচ বোস। সেই যে বিজ্ঞাপন ছিল; অঙ্গে মাখুন দেলখোস, ধন্য হবে এইচ বোস।

জীবনময় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সেই পরিবারের? সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে?

হেমাঙ্গ বললো, খুব দূর সম্পর্কের।

টিনা জিজ্ঞেস করলো, দেলখোস কী?

হেমাঙ্গ বললো, ও তোমরা জানবে না। এক ধরনের দিশি পারফিউম। টিনা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো তো?

টিনা বললো, বাঃ আমার কলেজ আছে না?

হেমাঙ্গ বললো, একটা-দুটো ক্লাস গুলি মারো!

টিনা বললো, আ-হা-হা আমার বন্ধু একটু বাদেই আমাকে নিতে আসবে।

হেমাঙ্গ বললো, তাকে ফোন করে দাও!

বেড়াতে যাবার কথা শুনে জীবনময় আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য শিখা এত কিছু ব্যবস্থা করে গেছে, তিনি কিছুই জানতেন না।

প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সাইট সিয়িং? পাগল নাকি! আমি বুড়োমানুষ, আমি কোথায় যাবো? এ দেশে তো অনেকবারই আসা হলো, বড় বড় দেখার জিনিসগুলো সবই দেখে নিয়েছি। এখানে আমি কী দেখতে যাবো?

হেমাঙ্গ বললো, ছোট শহর, এখানে বিশেষ কিছু নেই। মাইল পনেরো গেলে লেক মিশিগান, সেখানে বালির ওপর অনেকে রোদ পোহাতে যায়। আজ স্নো পড়ছে না। আর আছে টাওয়ার রেস্তোরাঁ, সেটা ঘোরে, আর তো শপিং মল।

জীবনময় বললেন, লেক মিশিগান আমি শিকাগোতে দেখেছি। সব শহরেই আজকাল টাওয়ার রেস্তোরাঁ আছে, কোনোটা চল্লিশ তলা ওপরে, কোনোটা আশি তলা, আর শপিং মলে আমি কক্ষনো যাই না। বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে নেই, কাদের জন্য কেনাকাটা করবো?

granthagar.weebly.com

হেমাঙ্গ বললো, শিখা বলে গেছে, লেক মিশিগানের ধারে আপনারা আজ লাঞ্চ খাবেন। একটা থাই রেস্তোরাঁ আছে, খুব ভালো খাবার!

জীবনময় বললেন, আমি দুপুরবেলা এখানেই স্যান্ডুইচ খেয়ে নেবো। বাড়িতে থাকতেই আমার ভালো লাগে, বই-টই পড়বো, টিভি দেখবো, তারপর সন্ধেবেলা ওরা ফিরলে গল্প করবো।

টিনা বললো, হেমাঙ্গদা, আপনি তা হলে সেলিমকে নিয়ে যান। উনি তো প্রথম এসেছেন, কিছু দেখেননি! উনি অনেকক্ষণ ধরে জামাকাপড় পরে রেডি হয়ে আছেন।

হেমাঙ্গ এমনভাবে টিনার দিকে তাকালো যেন এখুনি রাগের চোটে তাকে ভস্ম করে দেবে। শিখার মামাবাবুকে খাতির করা এক কথা। তিনি যদি না যান, তা হলে শুধু শুধু একজন অচেনা, অনাত্মীয় ব্যাটাছেলের জন্য সে দুপুরটা নষ্ট করবে?

সে বললো, তা হলে তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে, টিনা। আমি গাড়ির ড্রাইভারি করতে পারি, কিন্তু গাইড হবে তুমি।

টিনা বললো, আমি ক্লাস নষ্ট করবো নাকি?

হেমাঙ্গ বললো, সে সব আমি জানি না। আমারও কি কাজ ছিল না?

টিনা এক পলক তাকালো সেলিমের দিকে। তার মায়া হলো। ছেলেটি বেরুবার জন্য ব্যাকুল। সারাদিন বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকতে ওর ভালো লাগবে কেন? বুড়ো মানুষদের কথা আলাদা। টিনার আজ বেলা দুটো পর্যন্ত কোনো ক্লাস নেই, সে সকাল সকাল গিয়ে লাইব্রেরি ব্যবহার করে।

একটু পরে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন। জীবনময় আরও এক কাপ কফি খেলেন। বেশি কফি খাওয়া তাঁর হৃদযন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়, তবু অনেকদিনের নেশা।

আমেরিকার কোনো বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকতে তাঁর ভালো লাগে। এরকম নিস্তব্ধতা আর কোথাও উপভোগ করা যায় না। জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকে বলে, বাইরের রাস্তার গাড়ির শব্দও শোনা যায় না।

অকারণেই একবার ওপর-নিচ করলেন জীবনময়, বেসমেন্টটাও দেখে এলেন। ইচ্ছে করলে তিনিও এরকম একটি বাড়ির মালিক হতে পারতেন। অনেকবারই ইংল্যান্ডে কিংবা আমেরিকায় তিনি চাকরির সুযোগ পেয়েছিলেন। এইসব দেশে থাকলে কি জীবন অন্যরকম ব্যঞ্জনা পেত? যে যাতে আনন্দ পায়। জীবনময়ের মনে হতো, যেখানে জন্মেছেন, যেখানে বাল্য-কৈশোর কেটেছে, যেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগাযোগ, যেখানকার মানুষজনের প্রকৃতি তাঁর জানা, সেখানেই তাঁর ভালো লাগবে। তাঁদের পরিবার একসময় সচ্ছল ছিল, টাকা-পয়সার কখনো অভাব বোধ করেননি বলেই ডলার-পাউন্ডের হাতছানিও তাঁকে আকৃষ্ট করেনি।

জীবন তো প্রায় কেটেই গেল, ভুল হয়েছে কি কিছু?

জীবনময় নিজের বুকে হাত বুলোতে লাগলেন।

হেমাঙ্গর গাড়িতে সামনের সীটে বসেছে টিনা, পেছনে সেলিম। একটুখানি যাবার পরেই হেমাঙ্গ টিনাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি একটু চালাবে নাকি?

টিনা বললো, আমার এখনো লাইসেন্স হয়নি, তা জানেন না? খপ করে এসে পুলিশ ধরবে।

হেমাঙ্গ বললো, সে রিস্ক আমার। হাইওয়েতে চালানো প্র্যাকটিস না করলে তোমার কনফিডেন্স আসবে কী করে?

—পুলিশ যদি ধরে, তা হলে কার কতটা শাস্তি হবে? আমাকে

granthagar.weebly.com

জেলে দেবে ?

তোমার কিছুই হবে না। আমার গাড়ি আমি এমন একজনকে চালাতে দিয়েছি যার লাইসেন্স নেই, পুরো দোষটা পড়বে আমার ঘাড়ে।

তবু আপনি এই ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন ?

বিকজ আই কেয়ার ফর ইউ !

এই কথাটা আপনি আর কতজন মেয়েকে বলেছেন ? চল্লিশ, পঞ্চাশ ?

ইয়ার্কি হচ্ছে ? শোনো টিনা, যতদিন তুমি গাড়ি চালাবার লাইসেন্স না পাবে, ততদিন তুমি স্বাধীন হবে না। ততদিন দিদি জামাইবাবুর কাছে কচি-খুকিটি হয়ে বসে থাকতে হবে। নিজের ইচ্ছেমতন কোথাও যেতে পারবে না। এ দেশে ড্রাইভিং লাইসেন্সই স্বাধীনতার চাবিকাঠি। তুমি লাইসেন্স পেলেই তোমায় শস্তায় একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনিয়ে দেবো।

—আপনি আমাকে এত সাহায্য করতে চাইছেন যে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে বিয়ে করে ফেলি !

—ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ! তবে প্রথমেই বিয়ে করার আগে কিছুদিন লিভিং টুগেদার...

granthagar.weebly.com

—লাভলি আইডিয়া। আজই ছোড়দিকে বলবো।

—না, না, না। এক্ষুনি শিখাকে কিছু বলবার দরকার নেই।

—কেন, ছোড়দিকে অত ভয় কেন ? ছোড়দির সঙ্গেও কখনো লিভিং টুগেদার-এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন নাকি ?

দু'জনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলো।

টিনা বললো, আমি কিন্তু এখনো গাড়ি চালাবার প্রস্তাবটা নিতে রাজি আছি।

হেমাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার শোলডারে গাড়িটাকে এনে থামালো। সীট বদলা-বদলি করতে গিয়ে টিনার হঠাৎ মনে পড়লো, সেলিমের সঙ্গে একটাও কথা বলা হয়নি।

সে খানিকটা লজ্জিতভাবে বললো, আমি গাড়ি চালালে আপনার আপত্তি নেই তো ? ভয় পাবেন না। আমি ভালোই শিখেছি।

সেলিম বললো, না, না, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

—আপনি গাড়ি চালাতে জানেন ?

—জী, জানি। ঢাকায় চালিয়েছি।

—ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স করিয়ে এনেছেন ?

—আনা হয় নাই।

—প্যারিসে কী করে যাতায়াত করতেন ?

—মেট্রো। ওখানে খুব সুবিধা আছে।

টিনা স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে স্টার্ট দিতেই হেমাঙ্গ বললো, ডান দিকটা দেখে নাও, ইন্ডিকেটর দাও।

টিনা বললো, আমাকে অত ডিকটেট করতে হবে না। আগে কী রকম চালাই দেখুন!

ভালোই চালায় টিনা। হাত স্টেডি। তার আত্মবিশ্বাস প্রবল। এখানকার বাঙালি মহিলা সমাজের মতে, টিনা বেশ অহঙ্কারী। কারণ সে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে নিজের যোগ্যতায় এ দেশে এসেছে। অন্য মহিলারা প্রায় সবাই আসার সুযোগ পেয়েছে বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে।

মাইল দশেক চালাবার পর টিনা একটু ঘাবড়ে গেল। আয়নায় দেখতে পেল পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি। এ দেশের পুলিশের গাড়িগুলো জমকালো, ওপরে আলো ঝিকমিক করে। পুলিশদের পোশাকও যুদ্ধরত সৈনিকদের মতন। ট্রাফিক পুলিশদের বিচিত্র কৌশল সম্পর্কে কত রকম কাহিনীই না প্রচলিত আছে।

টিনা বললো, এই রে, এই রে, পুলিশ এসে গেছে।

হেমাঙ্গ পেছনে না তাকিয়ে বললো, তাতে কী হয়েছে, তোমার ঘাবড়াবার কী আছে। পুলিশ বুঝবে কী করে ?

—ওরা নাকি মুখ দেখে বুঝতে পারে ?

—বুলশীট! মুখখানা হাসি হাসি করে রাখো। ঠিকই তো চালাচ্ছো। স্পিড বাড়িও না।

এই সুযোগে হেমাঙ্গ টিনার কাঁধে একটা হাত রাখলো। হাতের পাঞ্জাটা ঝুলে রইলো বুকের কাছে। আদুরে গলায় বললো, আমি থাকতে পুলিশ কিচ্ছু করতে পারবে না। এ দেশের পুলিশদের কী করে ট্যাক্‌ল করতে হয় আমি জানি।

টিনা বেশ কড়া গলায় বললো, টেক ইয়োর হ্যান্ড অফ্ মাই নেক। আমি কচি খুকি নই।

পুলিশের গাড়িটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না।

খানিক দূরে একটা রেস্ট এরিয়ায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে টিনা বললো, এরপর আপনি চালাবেন। এখানে প্ল্যানটা ঠিক করে নেওয়া যাক।

হেমাঙ্গ বললো, প্ল্যানের কী আছে! দুপুরে থাই রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করবো।

granthagar.weebly.com

টিনা বললো, দুপুরের অনেক দেরি আছে।

নিজে গাড়ি থেকে নেমে সে সেলিমকে বললো, নামুন, একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিন।

টিনা অনুভব করলো, সেলিমের প্রতি একটু অবিচার হচ্ছে। সেলিমকে ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যই বেরোনো, অথচ হেমাঙ্গ সবটা মনোযোগ দিচ্ছে তার দিকে। সেলিম বেচারি চুপচাপ বসে থাকছে পেছনের সীটে।

টিনা জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি এইরকম লং ড্রাইভ ভালো লাগছে, না শহরের মধ্যে দোকান-টোকান দেখবেন?

সেলিম বিনীতভাবে বললো, আপনারা যেখানে নিয়ে যাবেন!

টিনা বললো, আমরা যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। আপনার কী পছন্দ?

সেলিম বললো, এই তো বেশ লাগছে।

হেমাঙ্গকে সেলিমের প্রতি মনোযোগী করবার জন্য টিনা বললো, হেমাঙ্গদা, কাল ওঁর মূকাভিনয় কেমন দেখলেন?

হেমাঙ্গ ভুরু কুঁচকে বললো, মন্দ নয়। নট ব্যাড রিয়েলি। অনেক রকম এক্সপ্রেশান আছে। তবে আমেরিকায় এ জিনিস চালানো শক্ত।

grontho nagar.weebly.com

টিনা বললো, কেন, আমেরিকানরা প্যান্টোমাইম দেখে না? ওদের স্ল্যাপ স্টিক, বার্লেস্ক থিয়েটারে প্যান্টোমাইম নেই?

হেমাঙ্গ বললো, আছে, থাকবে না কেন? তবে, এখানে ওই ঢাকার রিক্সাওয়ালা চলবে না। এখানে আমেরিকানদের জীবন নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি, কোনো বিখ্যাত লোকের নকল, এইসব পছন্দ করে। আর যদি ওরিয়েন্টাল সাবজেক্ট দেখাতে হয়, তা হলে জবরজং পোশাক পরে অদ্ভুত কিছু দেখাতে হবে। আর ওই যে নিজে নিজে প্রত্যেকটা আইটেমের পোস্টার দেখানো, ওটাও চলবে না। দুটো-তিনটে ছুঁড়ি রাখতে হবে, তারা প্যান্টি আর ব্রা পরে কোমর দুলিয়ে নেচে নেচে দেখিয়ে যাবে। এসব না থাকলে আমেরিকানরা টিকিট কাটবে না।

সেলিম অস্ফুটভাবে বললো, তাতে তো যে অনেক খরচ।

হেমাঙ্গ বললো, ঠিক বলেছো ভাই! কথায় বলে না, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা! এ দেশের পারফরমিং আর্টসে আগে অনেক টাকা খরচ করলেই তবে বিস্তর টাকা রোজগার করা যায়। প্রথমেই গরিব গরিব ভাব দেখালে কেউ পাত্তাই দেবে না!

টিনা বললো, একজন কোনো স্পনসর ধরতে হবে। দেখি,

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা কোনো শো-এর ব্যবস্থা করা যায় কি না!

সেলিম কৃতজ্ঞ চোখে টিনার দিকে তাকালো।

হেমাঙ্গ বললো, তোমাকে আর একটা পরামর্শ দেবো ভাই? তোমার চেহারাখানা তো আছে কার্তিকের মতন। মুখচোরা না থেকে চালু হয়ে যাও। একটা এলেবেলে চেহারার আমেরিকান মেয়েকে পটাও, ঝপ করে তাকে বিয়ে করে ফেলো। যে-সব মেয়ের চেহারা ভালো নয়, তাদের কোনোদিন বিয়ের আশা নেই এ দেশে, আমাদের দেশের ছেলেরাই তাদের বিয়ে করে। সে রকম একজনকে গাঁথতে পারলে তোমার সিটিজেনশিপ হয়ে যাবে। তারপর তুমি যা খুশি করো। ইললিগ্যাল ইমিগ্র্যান্ট হয়ে থাকলে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে, বড় কাজ কিছু করতে পারবে না।

এরকম কথা যে সেলিম আগে কখনো শোনেনি তা নয়, তবু সে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো।

হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে হেমাঙ্গ জিজ্ঞেস করলো, তোমার দেশে একটা বউ আছে নাকি? এ দেশে কিন্তু শরিয়তি নিয়ম খাটে না!

সেলিম মাথা নেড়ে বললো, না, না! আমার চাকরি-বাকরি ছিল না।

gronthagar.weebly.com

এরপর লেক মিশিগানের ধারে গিয়ে ওরা বসলো। হ্রদ তো নয়, যেন সমুদ্র, নীল জল, ঢেউ তুলে আসছে জাহাজ।

হেমাঙ্গ গান ধরলো, আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে, অকূল দরিয়ার মাঝে কূল নাহি পাই...।

টিনা বললো, আমাকে কিন্তু ঠিক দুটোর মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে দিতে হবে।

হেমাঙ্গ বললো, আমারও তিনটের সময় জরুরি কাজ আছে। এক কাজ করবো, আগে সেলিম সাহেবকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তারপর তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে দেবো। আমার কাজটাও এদিকে।

টিনা হাসলো। হেমাঙ্গর মনের ইচ্ছেটা বোঝা বেশ সহজ। সেলিমকে কাটিয়ে দিয়ে হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ অন্তত টিনার সঙ্গে একা ড্রাইভ করতে চায়। এখানে টিনার বদলে অন্য একটি মেয়ে থাকলে তার সঙ্গেও হেমাঙ্গ এই একই রকম ব্যবহার করত।

সেলিম দুপুরে ফিরে এসে দেখলো, জীবনময় দু' তিনটি বই খুলে কী সব নোট করছেন। পড়াশুনো আর পড়াশুনো, সারাটা জীবন

পড়াশুনোতেই কেটে গেল।

জীবনময় জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, কী রকম লাগলো ? থাকতে পারবি এদেশে ?

সেলিম উৎসাহের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, স্যার।

জীবনময় বললেন, আমি তোকে হুট করে নিয়ে এলাম। পরে আমাকে দোষ দিবি না তো ? আমি তো চলে যাবো, তারপর তোকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে হবে। স্ট্রাগ্‌ল করতে হবে অনেক। এখনো ভেবে দ্যাখ, আমার সঙ্গে ফিরে যাবি কিনা !

সেলিম বললো, স্যার, এমন সুযোগ আমি পাবো, স্বপ্নেও ভাবিনি !

॥ ৪ ॥

রাত্তিরবেলায় শিখা আর অনীশকে নিজের ঘরে ডেকে আলোচনায় বসলেন জীবনময়।

ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানায় তাঁর একটা সেমিনার আছে বুধবার। সুতরাং কালই তাঁকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তিনি গ্রে হাউন্ড বাস ধরবেন।

শিখা বললো, সে কি, মাত্র দু'দিন থাকবে আমাদের কাছে ? এ ভারী অন্যায় !

gronthagar.weebly.com

জীবনময় হেসে বললেন, ইংরিজিতে একটা কথা আছে, অতিথি এবং মাছ, দু' দিনের বেশি থাকলেই পচা গন্ধ ছাড়ে !

শিখা রাগ করে বললো, তুমি বুঝি অতিথি ? নিজের মামা কখনো অতিথি হয় ?

জীবনময় বললেন, নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তো বিশেষ থাকিনি। সবাই চলে গেল ইন্ডিয়ায়, আমি রয়ে গেলাম পাকিস্তানে। ঠাকুমা মারা যাবার পর আর কেউ রইলো না।

—টাঙ্গাইলের বাড়িটাও তো গেছে। তবু কোন টানে তুমি রয়ে গেলে বাংলাদেশে ? কলকাতায় গেলে কাজ পেতে না ?

—ভিতুর মতন পালিয়ে যাবো কেন ? ঢাকায় তো আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

—বিয়েও তো করলে না।

—সময়ই পেলাম না। পড়ানোর নেশা, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই এতগুলো বছর কেটে গেল। যাক ওসব কথা। আসল কথাটা বলি। আমি একটা অন্যায় করেছি, তোদের বাড়িতে সঙ্গে করে

একজন উটকো অতিথি নিয়ে এসেছি।

—না, না, তাতে কী হয়েছে! কোনও অসুবিধে নেই।

—ওটা তোদের ভদ্রতার কথা। কিংবা উদারতা। কিন্তু এরকম কেউ আনে না। ছেলেটাকে আমি চিনি অনেকদিন। পুরানো পল্টনেই ওদের বাড়ি। অল্প বয়েসে মা-মরা ছেলে, ওর বাবার দ্বিতীয় পক্ষে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে, বাড়িতে কোনোকালে ওর আদর নেই। খুব একটা চালু ছেলে নয়, মুখচোরা, হম্বিতম্বি করে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। তারপর দ্যাখ না, বোকার মতন নিজের ভাগের যা কিছু ছিল বিক্রি করে প্যারিস চলে গেল। এখন খালি হাতে দেশে ফিরলে খুব বিপদে পড়ে যাবে।

অনীশ বললো, কিন্তু মামাবাবু, এদেশে এখন কাজ-টাজ জোটানো খুব শক্ত। নতুন লোক এলেই পুলিশ নজর রাখে।

জীবনময় বললেন, তা জানি। তবু লোকে এখনো বলে, আমেরিকাই হচ্ছে দা ল্যান্ড অফ অপারচুনিটি। আর কোন দেশে যাবে? পশ্চিম জার্মানিতেও সহজে ঢুকতে দেয় না।

—এখানে কোথায় থাকবে?

—সেই জন্যই তো তোমাদের ডেকেছি। তোমাদের এখানে থাকবে না। এত ছোট শহরে ও কোনও সুযোগ পাবে না। নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহরেই সুবিধে। ওখানে অনেক বাংলাদেশী আছে। তাদের মধ্যে মিশে যেতে পারে। আমি দু'জনকে চিনি, তারা ব্যবসা-ট্যাবসা করে, ভেবেছিলাম তাদেরই একজনের কাছে ওকে গস্ত করে দেবো। এমনই কপাল, সেই দু'জনই এখন ঢাকায় গেছে। নিউ ইয়র্কে ওকে কোথায় রেখে আসি? হাতে বেশি সময় ছিল না, তাই সঙ্গে করে আনতে হলো।

granthagar.weebly.com

শিখা বললো, এনেছেন বেশ করেছেন। ছেলেটি অতি ভদ্র।

অনীশ স্ত্রীর দিকে তাকালো। সে এই পরিবারের অধিপতি, তার স্ত্রী তার মতামত জানাবার সুযোগ দিচ্ছে না।

জীবনময় বললেন, তোদের আর একটু ট্রাবল দেবো। ব্লুমিংটনে ওকে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না। আমি নিউ ইয়র্ক ফেরার পথে ওকে তুলে নিয়ে যাবো। আর মোট চারদিন ছেলেটাকে তোদের বাড়িতে রাখতে পারবি?

শিখা এবার স্বামীর চোখের দিকে তাকালো।

অনীশ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে উদার ভাবে বললো, নো প্রবলেম। কয়েকটা দিন থাকবে-খাবে, এ আর এমন কি ব্যাপার। ওকে নিয়ে

ঘোরাঘুরি করার লোক পাওয়া যাবে না।

জীবনময় বললেন, তার দরকারও নেই। বাড়িতেই থাকবে। আমি ব্লুমিংটন থেকে ফোনে যোগাযোগ রাখবো, ওখানে সেমিনার শেষ হলে আমি নিউ ইয়র্কে আরও দিন সাতেক থাকতে পারি। তার মধ্যে ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

শিখা জিজ্ঞেস করলো, জীবনমামা, তুমি আর ক' জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এরকম করেছো?

জীবনময় হেসে বললেন, কী রকম যুগ পড়েছে জানিস। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পড়ালেই হয় না, তারা পাশ করবার পর তাদের চাকরি জোগাড়ও করে দিতে হয়। ভালো ভালো রেজাল্ট করা ছাত্র বেকার বসে থাকে। এম এ পাশ করার পর সামান্য একটা স্কুল মাস্টারি জোগাড় করার জন্য ছোটাছুটি করে হন্যে হয়ে। একদিন দেখি, নিউ মার্কেটে একটা বাচ্চাদের খেলনার দোকানের কাউন্টারে বসে ক্যাশমেমো কাটছে আমার এক ছাত্র, এম এ তে সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা তোদের পারিবারিক ব্যবসা নাকি রে, ইউসুফ? সে লজ্জা পেয়ে বললো, না স্যার, আর কিছু না পেয়ে এখানে এই চাকরি করছি। আমি ভাবলাম, হায় রে কপাল! এই সব ছাত্রদের পড়িয়ে কী লাভ হলো? দোকানের ক্যাশমেমো কাটার জন্য কি ইকোনমিক্‌সে এম এ পড়া লাগে? শুধু শুধু আমাদের পণ্ডশ্রম!

granthagar.weebly.com

অনীশ বললো, পশ্চিমবাংলাতেও তো একই অবস্থা!

জীবনময় বললেন, খুব তফাত আর কী করে হবে? যোগ্যতা আছে, অথচ কাজ নেই। বাংলাদেশের ছেলেরা ওই জন্য একটু সুযোগ পেলেই বিদেশে চলে যায়। কষ্ট করে থাকে। কোনও রকমে একটা জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

অনীশ বললো, সকলের তাও হয় না। অনেককে ফিরেও যেতে হয়। এখানেও এখন চাকরি বাকরির বাজার খুব খারাপ। আপনি যে সেলিমকে আনলেন, প্যান্টোমাইম করা ছাড়া ওর আর কোনও যোগ্যতা নেই। ওই যোগ্যতায় ওর তেমন সুবিধে হবে বলে মনে হয়

সামনে কেঁদে ফেলেছিল। অন্য কারুকে যে কথাটাও বলতে পারেনি, সেটা যে আমি আগেই জানি। ঢাকায় ওর নামে একটা পুলিশ কেস আছে, ফিরে গেলেই ওকে ক্যাঁক করে ধরবে! ফেরার যে ওর উপায় নেই।

শিখার মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এলো।

অনীশ বললো, খুন!

জীবনময় বললেন, হ্যাঁ, মার্ডার চার্জ। কিন্তু সেলিম খুনী নয়, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। ব্যাপারটা হয়েছিল বছর তিনেক আগে। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিরাট উৎসব হয় জানো তো? সেবারে একুশে ফেব্রুয়ারির আগের রাত্রে শহিদ মিনারে আগে মালা দেবার তুচ্ছ অজুহাতে দু'দল ছাত্রে মারামারি লেগে গিয়েছিল। আসলে একদল উগ্র মৌলবাদী ছাত্র চেয়েছিল গণ্ডগোল পাকাতে। ওখানে ছাত্রদের কাছেও রিভলভার, বন্দুক থাকে। সেই মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল সেলিম। একটি ছাত্র খুন হয়। আমি সেলিমকে ছোটবেলা থেকে চিনি, ওর নরম স্বভাব, খুনোখুনি করা ওর পক্ষে সম্ভবই নয়। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, আসল কালপ্রিটদের গায়ে ছোঁয়া লাগে না, যাদের পেছনে রাজনৈতিক মুরুব্বি থাকে, পুলিশ তাদের ধারে কাছে যায় না, নিরীহ ছেলেদের নামেই দোষ চাপিয়ে দেয়। সেলিম আর দু'জনের নামে পরোয়ানা আছে, সেই থেকে সেলিম পালিয়ে পালিয়ে থেকেছে, ওর এম এ পড়াও হয়নি। কিন্তু আমি তোমাদের ওয়ার্ড অফ অনার দিতে পারি, সেলিম খুনী নয়। এখন দেশে ফিরলে শুধু শুধু একটা নিরপরাধ, ভালো ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে!

granthagar.weebly.com

শিখা আর অনীশ চুপ করে রইলো। সেই নীরবতার মধ্যে একটা প্রতিবাদ আছে।

জীবনময় তা বুঝে বললেন, তোমাদের কোনও রকম বিপদে ফেলতে চাই না। এসব কথা কারুকে বোলো না। ওকে আমি নিউ ইয়র্ক নিয়ে যাবো। কামালুদ্দিনের দু'খানা রেস্তোরাঁ আছে ব্রুকলিনে, ভালো অবস্থা, সে আমার ছাত্র ছিল, সে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেবে। সামনের রবিবারই ঢাকা থেকে ফিরে আসবে কামালুদ্দিন। সে আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস গোপন করে শিখা জিজ্ঞেস করলো, মামাবাবু, তুমি যে একজন খুনের আসামীকে সাহায্য করছো, এ খবরটা ঢাকায় পৌঁছে গেলে তোমার কোনও বিপদ হবে না?

জীবনময় ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, আমার আবার কী বিপদ হবে? জীবন তো প্রায় শেষ করে এনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেও আর ভালো লাগে না। সে রকম ছাত্রও আর পাই না। এখন আমার শেষ ইচ্ছে কী জানিস? ঢাকা ছেড়ে টাঙ্গাইল ফিরে যাবো। গ্রামে গিয়ে একটু ইস্কুল করবো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবো। লেখাপড়া শেখাটাই তো বড় কথা নয়, তাদের শেখাবো মানুষের মতন মানুষ হতে। জাত, ধর্ম এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তারা যেন মানুষকে ভালোবাসতে শেখে। আমার যা টাকা পয়সা থাকবে, সব এতেই খরচ করবো। অন্তত যদি একশোটা ছেলেমেয়েকেও এভাবে তৈরি করতে পারি, তা হলেই বুঝবো আমার জীবনটা সার্থক।

জীবনময় সাধারণত কথাবার্তার মধ্যে বেশি আবেগ দেখান না। কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে ইস্কুল খোলা তাঁর এক প্রিয় পরিকল্পনা। এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শেষের দিকে তাঁর গলা কেঁপে গেল।

শিখা বললো, তুমি যখন ইস্কুল খুলবে, তখন আমরা এখান থেকে চাঁদা তুলে দেব।

পরদিন সকালবেলা গ্রে হাউন্ড বাস ধরলেন জীবনময়। শিখা তাঁকে তুলে দিয়ে এলো। বাস ছাড়ার সময় জীবনময় হাসি মুখে বললেন, ফেরার পথে তোদের বাড়িতে এক বেলা থাকবো। ট্রাউট মাছ জোগাড় করে রাখিস। ওই মাছটা দেশে পাওয়া যায় না।

granthagar.weebly.com

দু' জনের কেউই বুঝলো না। এটাই তাদের শেষ দেখা।

সারাটা পথ নিজের লেখা নোট পড়তে পড়তে গেলেন জীবনময়। সেমিনারে কিছুই কাজের কাজ হয় না ঠিকই, তবু জীবনময় নিজের পেপার পাঠ করার সময়ে ফাঁকি মারেন না। ফাঁকির ব্যাপারটাই তাঁর চরিত্রে নেই।

ব্লুমিংটনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দু'জন অধ্যাপক উপস্থিত হয়েছেন। বাস থেকে নামার সময় জীবনময় প্রথমে একেবারে সুস্থ

এরকম খবর পাবার পর আর অফিস থেকে ছুটি পাওয়া-না পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অনীশের খুবই গুরুতর কাজ আছে, তাই শিখা অফিসকে জানিয়ে চলে এলো ব্লুমিংটনে।

হাসপাতালের শয্যায় নাকে-হাতে-পায়ে নানারকম নল ও তার লাগানো জীবনময়কে যেন চেনাই যায় না। ডাক্তাররা বেশ রাগারাগি করতে লাগলো শিখার ওপরে। জীবনময়ের হৃৎপিণ্ডে একটা ফুটো আছে, অথচ তিনি তার কোনো চিকিৎসা করাননি কেন এতদিন ?

হাসপাতালের কাছাকাছি একটা হোটেলে ঘর ভাড়া নিল শিখা। দু' বেলা জীবনময়ের খাটের পাশে বসে থাকে, আর তো কিছু করার নেই।

তৃতীয় দিনে চোখ মেললেন জীবনময়। কিন্তু শিখাকে তিনি চিনতে পারলেন না। তিনি যে আমেরিকায় এক হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছেন এ বোধই তাঁর নেই। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ঠাকুমা, তোমার বাড়ির ঠাকুর দালানে এখন তো পুজো হয় না, ওখানে আমি একটা ইস্কুল করবো...তুমি আমাকে, যখন ছোট ছিলাম, নারকেলের নাড়ু বানিয়ে দিতে, ওই ছেলেমেয়েদের জন্যও। তুমি ওদের খাওয়াবে ....বুড়ি, আর সবাই ইণ্ডিয়ায় চলে গেল, আমি তো

gronthagar.weebly.com

তোমাকে ছেড়ে যাইনি, তোমার পাশেই থাকবো...এত বড় বাড়ি...পাক হানাদাররা আসছে, ওই যে আসছে, ভয় পেয়ো না ঠাকুমা, গ্রামের মানুষ আমাদের বাঁচাবে...কাদের সিদ্দিকি বলেছে...ঠাকুমা, ওই দ্যাখো, বাবা আর মা ফিরে এসেছে, তুমি কাঁদছো কেন মা, মায়ের কান্না যে সন্তান সহ্য করতে পারে না...সেলিম, সেলিম, তুই তা হলে...

জীবনময়ের কথা শেষ হলো না। সেলিম সম্পর্কে কী নির্দেশ দিতে চাইছিলেন, তা জানা গেল না আর।

ডেড বডি কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে ? ঢাকায় পাঠাবার কোনো মানে হয় না, সেখানে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। ইণ্ডিয়াতে আর দু'জন মামা আছে, কিন্তু জীবনময় বাংলাদেশের নাগরিক, ইণ্ডিয়ায় যেতে গেলে তাঁর ভিসা লাগতো। মৃতদেহের কি ভিসা লাগে ?

এত কিছু একা সামলাতে পারবে না শিখা। কান্না চাপতে চাপতে সে অনীশকে ফোন করলো, তুমি এসো, তুমি এসো, প্লিজ একবার এসো !

ভাগ্যিস জীবনময় শুক্রবার মারা গিয়েছিলেন। শনি-রবি ছুটি। শনিবার সকালে প্লেনে চলে এলো অনীশ। সেলিম খুব আসতে চেয়েছিল তার সঙ্গে, কিন্তু শুধু শুধু বেশি পয়সা খরচ করার কোনো

মানে হয় না বলে অনীশ তাকে আনেনি।

ক্রিমেটোরিয়ামে পুড়িয়ে ফেলা হলো জীবনময়ের শব। টাঙ্গাইলের মিত্তির বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেল বাংলাদেশের। আর কেউ রইলো না।

শিখার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া তেমন তো কোনো হৃদয়ের টান ছিল না তার এই মামার। সুতরাং এই শোক দীর্ঘস্থায়ী হবার কথা নয়। তা ছাড়া এদেশে শোক করার সময়ই বা কোথায় ? শিখা যাতে বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি না করে, তাই ব্লুমিংটনেই রবিবারটা থেকে গেল অনীশ। জীবনময় নিজের মুখে ট্রাউট মাছ খেতে চেয়েছিলেন, সেটা খাওয়ানো গেল না বলেই শিখার বেশি আফশোস।

অন্যান্য খরচ ছাড়াও ফোনের খরচ হলো অনেক। কলকাতায় মা ও অন্য মামাদের সঙ্গে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। শিখা এখান থেকে ডেথ সার্টিফিকেট পাঠালে তার ছোটমামা ঢাকায় গিয়ে জীবনময়ের পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।

আমেরিকায় একটা সুটকেসও নিয়ে আসেননি জীবনময়। শুধু একটা মাঝারি সাইজের ঝোলা ব্যাগ। তার মধ্যে রয়েছে তার মাত্র দু' প্রস্থ পোশাক, বই-কাগজপত্র, আর তিনশো ডলারের ট্রাভেলার্স চেক,

gronthagar.weebly.com

ক্যাশ একশো দশ ডলার। হাসপাতালের খরচ কিছু লাগলো না। সেটা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ই মিটিয়ে দিল। কিন্তু পোড়াবার খরচ, অনীশ-শিখার আসা-যাওয়া, থাকার খরচ ওদেরই। ট্রাভেলার্স চেকগুলো আর ভাঙানো যাবে না কক্ষনো। ক্যাশ এক শো দশ ডলার কে নেবে ?

শিখা বললো, ও টাকাটা সেলিমকে দিয়ে দাও !

অনীশ চুপ করে রইলো। সে কৃপণ নয়। লোকে ভাবে, আমেরিকায় যারা চাকরি করে তারা সবাই বুঝি খুব বড়লোক। কিন্তু ছেলে-মেয়ের পড়াশুনোর খরচ যাদের চালাতে হয়, তাদের হিসেব করে চলতে হয় সব সময়। হঠাৎ হাজার দেড়েক ডলার খরচ হবার ধাক্কাটা কম নয়। এই একশো দশ ডলার সেলিম পাবে কোন্

কলেজে। সেলিম একা থাকে। দুপুরে সে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে খায়। টিভি দেখে। তাকে বাড়ির একটা চাবি দেওয়া হয়েছে, তবু সে বিশেষ বেরোয় না। জীবনময় চলে যাওয়ায় সে যেন আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। অন্য কোনো বাড়িতে পার্টি থাকলেও সে অনীশ-শিখার সঙ্গে যেতে চায় না। এদেশে অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অন্য লোকজনদের সঙ্গে মিশতে যেন ভয় পায় সেলিম।

একদিন অনীশ একটা পার্টিতে কিছুটা বেশি মদ্যপান করে ফেলে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে শিখাকে বললো, আর কতদিন ওই ছোকরাটিকে রাখবে?

শিখা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সে জানতো, অনীশ এ প্রশ্ন করবেই। এ প্রশ্ন তো সর্বক্ষণ তার মাথাতেও ঘুরছে। একে তো তার বোন টিনা এখানে এসে রয়েছে, তার ওপর জীবনমামা আর একজনকে গছিয়ে দিয়ে গেছেন। সবই তো শিখার দায়িত্ব!

অনীশ বললো, আনিসুজ্জামান কী রকম স্বার্থপর দেখলে? আজ পার্টিতে আমি কথায় কথায় ওকে সেলিমের কথা বললাম। কোনো আগ্রহই দেখালো না। হি জাস্ট ডিডন'ট কেয়ার! একটা মুসলমান ছেলে বিপদে পড়েছে, সে কোথায় থাকবে, তার ভবিষ্যতে কী হবে, তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই!

granthagar.weebly.com

শিখা আহতভাবে বললো, ওরকমভাবে বোলো না!

অনীশ চটে গিয়ে বললো, তার মানে?

কী খারাপ ভাবে বলেছি? হোয়াট ডু ইউ মিন?

—মুসলমান ছেলে বলেই আনিসুজ্জামানরা দায়িত্ব নেবে? আমার মামা কোনোদিন হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের আলাদা করে দেখেননি, ও ছেলেটা যদি হিন্দু হতো, তা হলে ওকে আমরা কার কাছে পাঠাতাম?

—কী? তুমি আমার ওপর লেকচার ঝাড়ছো? ও সব বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। বী প্র্যাকটিক্যাল মাই ডিয়ার! একটা বাংলাদেশী ছেলে এখানে ফালতুভাবে এসে পড়েছে, তার দায়িত্ব বাংলাদেশীদেরই নেওয়া উচিত! আমরা শুধু শুধু ওকে দিনের পর দিন খাওয়াতে যাবো কেন?

—একটা মানুষের খেতে আর এমন কী খরচ লাগে!

—ও কতটা ভাত খায় দেখেছো? সব বাঙাল বেশি ভাত খায়! বাটি বাটি ডাল চুমুক দিয়ে খায়।

—আস্তে, চেঁচিয়ো না প্লিজ!

—মোটেই আমি চ্যাঁচাইনি। কাল সকালেই আমি ওই ছোকরাকে বললো, গেট লস্ট!

শিখা জানে, অনীশের যেদিন নেশা হয়, সেদিন সে তার কোনো কথারই প্রতিবাদ সহ্য করে না। এখন ক্রমশ রেগে যাবে।

সে অনীশের বুকের কাছ ঘেঁষে এসে তার পাজামার দড়ির গিঁট খুলে ফেলে আদুরে গলায় বললো, এখন ওই সব শুনতে ইচ্ছে করছে না। তুমি রোজ রোজ কেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছো?

অনীশ শিখাকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললো, শুধু খাওয়া নয়, তুমি আর একটা দিক চিন্তা করছো না। ছেলেটা প্রত্যেক সন্ধেবেলা টিনার ঘরে গিয়ে বসে থাকে, সেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।

এ চিন্তাও তো শিখার মাথায় আছেই। টিনার সঙ্গে সেলিমের ঘনিষ্ঠতা সেও লক্ষ করেছে। আজকেই পার্টিতে কুটুস কুটুস করে কথা শুনিয়েছে বাসবী।

বাসবী শিখাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ রে শিখা, সকালবেলা তোকে ফোন করেছিলুম, একটা ছেলে ফোন ধরলো, কে রে?

শিখা বলেছিল, আমাদের বাড়িতে সেই যে একটি ছেলে এসে আছে, প্যান্টোমাইম দেখিয়েছিল—

grontthagar.weebly.com

বাসবী ভুরু তুলে অনেকখানি বিস্ময় দেখিয়ে বলেছিল, ও—ও—ও, সেই ছেলেটি? এখনো আছে? আর কতদিন থাকবে?

—ঠিক নেই। ওর জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

—কী ব্যবস্থা করবি?

—দেখছি, যদি কোনো কাজ-টাজ।

—ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্ট, ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবি। আর একটা কথা বলি, তুই আর অনীশ সারাদিন অফিস করিস, টিনা আগে আগে বাড়ি ফিরে আসে। টিনা আর ওই ছেলে। ঘি আর আগুন!

—যাঃ, ওসব কিছু ভয় নেই। ছেলেটি খুবই ভদ্র, খুবই ভালো।

—ঘি আর আগুন কি খারাপ? দুটোই ভালো। কিন্তু কাছাকাছি রাখলে দপ করে জ্বলে ওঠে। মুসলমানের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিবি?

—আমি ওসব কিছু ভাবি না!

টিনা মুসলমান বা খ্রিস্টান বা হিন্দু যাকেই বিয়ে করুক, তা নিয়ে শিখার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু টিনা যদি সেলিমকে বিয়ে করতে চায়...ছেলেটার কোনো উপার্জন নেই, সে রকম কোনো যোগ্যতাও নেই, তা ছাড়া খুনের আসামি...না, না, না, টিনা অতি

তুষারপাত উপভোগ করা যায়। শিখার একটু ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে, তাই সে বাড়ি বেশি গরম করে রাখে। তাতে এক এক সময় গায় জ্বালা জ্বালা করে।

হস্টেলে থাকার অভ্যেস অনুযায়ী টিনা বাড়ির মধ্যে খুব কম পোশাক পরে থাকে। শাড়ি তো পরেই না প্রায়, জিন্‌সের চেয়েও শর্টস তার পছন্দ, এবং পাতলা টি-শার্ট। দিদি-জামাইবাবুর কাছে লজ্জার কিছু নেই। সেলিম এসে পড়ার পরও সে তার স্বভাব বদলায়নি। আসলে সে নিজে তো এই ধরনের পোশাককে আপত্তিজনক বলে ভাবতেই শেখেনি।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে ঝপ করে এক্ষুনি কোনো বিয়ে-টিয়ের মধ্যে যেতে চাইবেই না। ওদের মধ্যে সে রকম কিছু ঘটবেই না।

একটা ব্যাপার যে এর মধ্যেই ঘটে গেছে, তা শিখাও জানে না।

এ বাড়ির মধ্যে টিনার সঙ্গে কথা বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে সেলিম। অনীশকে সে একটু ভয় পায়, শিখার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে সর্বক্ষণ নুয়ে থাকে। টিনার সঙ্গে ব্যবহারই একেবারে স্বাভাবিক।

এখানে আসবার আগে টিনা দু'বছর দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, হস্টেলে থেকে এসেছে। সাজ-পোশাক ও মুখের ভাষা সম্পর্কে সব সংস্কার দূর হয়ে যায় হস্টেল জীবনে। দিল্লির গরমে হস্টেলের মধ্যে অনেক মেয়েই শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরে ঘুরে বেড়াতো। কেউ কেউ এমন অসভ্য কথা উচ্চারণ করতো যে প্রথম প্রথম কান গরম হয়ে যেত টিনার। তারপর সেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ওসব কিছুতে। দু-একবার গাঁজা টেনে দেখেছে, বীয়ার পান করতো নিয়মিত। ওই সময় ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও ছিল অনেক। চাল-চলন সবই পশ্চিমী ধরনের। সুতরাং আমেরিকায় পড়তে এসে এখানকার ক্যাম্পাসের জীবন এমন কিছু অভিনব মনে হয়নি টিনার। তাকে দেখে শিখাই বরং অবাক হয়েছিল। গত

grontthagar.weebly.com

এক-একদিন টিনা দুপুরের দিকে কলেজ থেকে ফিরে আসে। কিংবা কোনো কোনো দিন বেলা করে বেরোয়। সেই সময়টায় সেলিম ছাড়া আর কেউ থাকে না বাড়িতে। টিনার মন পরিষ্কার, তার ন্যাকামি নেই, আত্মবিশ্বাসও যথেষ্ট, সে সেলিমকে ভয়ও পায় না, এড়িয়েও চলে না। সেলিম যে সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকে, কোথাও যেতে চায় না, যেন আত্মগোপন করে আছে, এই ভাবটা টিনার অদ্ভুত লাগে। এ এক এমনই দেশ, এখানে সবাই সর্বক্ষণ ছুটছে, বাড়িতে থাকলেও কিছু না কিছু কাজ করবেই, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা তো আছেই, তা ছাড়া ছুতোর মিস্তিরি, কলের মিস্তিরি, ঘরামি, গাড়ি সারাবার মিস্তিরি, সব রকম কাজই করতে হয়। সেলিম কিছুই করে না। এমনকি পড়াশুনোর দিকেও ঝোঁক নেই! এই নিয়ে টিনা ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে, দু-একদিন সে জোর করে সেলিমকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেছে।

একদিন দুপুর তিনটেয় ফিরে এলো টিনা। মিকি তার স্কুলের এক বন্ধুর বাড়িতে ডে স্পেন্ড করবে, শিখা আর অনীশ যথারীতি অফিসে।

granthagar.weebly.com

টিনা চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখলো, সেলিম বসবার ঘরে টিভি-র সামনে বসে আছে। টিনা বললো, হাই! ক্লাসে যাবার আগে তোমাকে যেখানে বসে থাকতে দেখেছি, এখনো সেখানেই বসে আছো? এর মধ্যে একবারও ওঠোনি বুঝি?

সেলিম লাজুক ভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ, উঠে স্যান্ডুইচ খেয়েছি!

টিনা টিভি-র দিকে তাকালো। দুপুরবেলা পর পর সোপ সিরিয়াল চলে। টিনা একনজর দেখেই বুঝলো, এখন যেটা চলছে, সেটা জেনারাল হসপিটাল। এটা একেবারে পচা। বোরিং!

কাছে এসে টিনা বললো, তুমি এটা রেগুলার দেখো? ভালো লাগে?

সেলিম বললো, না, মানে, দেখি আর কি।

টিনা আরও কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, এই সময় পাবলিক নেটওয়ার্কে ক্লাসিক মুভি দেখায়, হঠাৎ হঠাৎ বাংলা সিনেমাও পাওয়া যায়।

চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক জায়গায় থেমে টিনা বললো, এই তো, ইটালিয়ান ফিল্ম, পাসোলিনির ছবি, তুমি দেখেছো আগে?

সেলিম টিভি-র দিকে না তাকিয়ে দেখছে টিনার ঘাড় ও বাহুর ডৌল। মাখনের মতন এই মেয়েটির ত্বক। এত কাছে!

পরের মুহূর্তেই টিনা নেমে গেল বেসমেন্টে।

ওপরের ছোট ঘরটা সেলিমকে ছেড়ে দিয়ে টিনা বেসমেন্টেই আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে অনেক জায়গা, বইপত্র, তার মিউজিক সিস্টেম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে পারে। আলাদা বাথরুমও আছে।

যতই ভালো সিনেমা হোক, তাতে মন লাগাতে পারছে না সেলিম। আরম্ভ হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে, মাঝখান থেকে সে গল্পটাও ধরতে পারছে না। সারাদিন মুখ বুজে থাকতে তার অসহ্য লাগে। টিনার সঙ্গেই তবু কিছুক্ষণ কথা বলা যায়। সন্ধের সময় টিনা যখন পড়াশুনো করে, তখন সেলিম তার কাছে গিয়ে বসলেও টিনা আপত্তি করে না।

সেলিম সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলো বেসমেন্টের সিঁড়ির দিকে।

সে আশা করেছিল, টিনা পোশাক বদলে আবার ওপরে উঠে আসবে। এক-একদিন দুপুরবেলা বাড়িতে ফিরেও টিনা একটু বাদে আবার বেরোয়। একটি চীনে ছেলে তাকে নিতে আসে।

আধ ঘন্টা কেটে গেল, তবু টিনা ওপরে এলো না।

টিভি দেখছে না, সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সেলিম উঠে দাঁড়ালো। নীচে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সেলিম বেসমেন্টে নেমে এলো নিঃশব্দে।

granthagar.weebly.com

মস্ত বড় একটা হলঘরের মতন। এক পাশে কয়েকটা আলমারিতে বাতিল জিনিসপত্র ঠাসা। অন্যদিকের আর একটা আলমারিতে চালের বস্তা থেকে টয়লেট পেপারের রোল পর্যন্ত মাসকাবারি জিনিস। একটা টেবিল টেনিস বোর্ড, এখন কেউ ব্যবহার করে না। এই দিকটা খানিকটা গুদামের মতন। অন্য দিকটা ঝকঝকে পরিষ্কার, সেখানে টিনার শোবার ব্যবস্থা।

খাটের ওপর বইপত্র ছড়ানো, টিনা সেখানে নেই।

কোথায় গেল টিনা? সেলিম লক্ষ করলো, বাথরুমের দরজার বাইরে ছিটকিনি লাগানো। এখান থেকে বাইরে বেরুবার তো আর কোনো দরজা নেই।

এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল, বেসমেন্টের এক কোণে আর একটা ঘর রয়েছে। ও ঘরে কখনো যায়নি সেলিম। তবে সে শুনেছে বটে যে অনীশের ছবি তোলার শখ আছে, সে নিজেই তার ফিল্ম ডেভেলাপ ও প্রিন্ট করে, সেই জন্য একটা ডার্ক রুম আছে। এটাই সেই ডার্ক রুম?

বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সেলিম। টিনা এর ভেতরেই

আছে, কাগজপত্র নাড়াচাড়ার খড়মড় শব্দ হচ্ছে। টিনা কী করছে এখানে, তার তো ছবি তোলার বাতিক নেই। তাকে কখনো ক্যামেরা নিয়ে বেরোতে দেখেনি সেলিম।

কৌতূহল যখন একবার চাপে, তখন তার শেষ উত্তরটা জানার জন্য মনটা ছটফট করে। সেলিমের পা সেখানে আটকে গেছে, সে সরে যেতে পারছে না, সে দরজায় কান পেতেছে।

সামান্য শব্দই মনে হয় রহস্যময়। সারা বাড়িতে আর কোনো শব্দ নেই। কত দূর দেশ থেকে এসেছে সেলিম, সে এক অনাত্মীয়ের বাড়িতে মাটির নীচে একটা বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এ বাড়িতে যে সে ক্রমশই অবাঞ্ছিত হয়ে উঠছে, তা কি সে অনুভব করে না ? তবু তার মনে হয়, এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে গেলেই সে বেশি বিপদে পড়ে যাবে।

এ ভাবে চুপি চুপি দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়, তাও সে জানে, তবু তার সরে যাবার উপায় নেই, ঘরের মধ্যে টিনা একা একা কী করছে, এটা না জানলে যেন তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে !

granthagar.weebly.com

হঠাৎ দরজা খুলে টিনা বেরোতেই সেলিমের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। টিনার হাতে কয়েকটি ছবির প্রিন্ট।

চমকে গেলেও মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল টিনা। স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এখানে কী করছো ?

সেলিম নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো টিনার দিকে।

এর মধ্যে স্নান করে নিয়েছে টিনা, তার চুল এখনও ভেজা। শরীরে শুধু একটা হাউজ কোট জড়ানো, তার তলায় কিছু নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার স্তনের রেখা, সেদিকে তাকাতেই অনুভব করা যায় তার ভেতরের নগ্নতা। এ সময় বেসমেন্টে কারুর আসার কথা নয়, টিনা এক-একদিন বাথরুমে স্নান সেরে একেবারে নগ্ন হয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে জামা-কাপড় পরে নেয়। এখন তো তবু সে একটা হাউজ কোট গায়ে রেখেছে।

টিনা সেলিমকে নীরব দেখে আবার জিজ্ঞেস করলো, কী হলো, কিছু বলবে ?

সেলিম এর পরে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো।

সে খপ করে টিনার একটি হাত চেপে ধরে বলে উঠলো, আই লাভ ইউ !

এবার টিনা স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো সেলিমের

দিকে। সরু ঘেরের পাজামা ও মেরুন রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি পরা সেলিমকে মনে হয় সিনেমার রাজকুমারের মতন।

একটানে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মাছরাঙা পাখির মতন তীক্ষ্ণ স্বরে হি-হি-হি করে হেসে উঠলো টিনা।

মেয়েদের এই সেই হাসির অস্ত্র যাতে মহা মহা বীরপুরুষও ঘায়েল হয়ে যায়।

রেগে উঠলে তবু মানে বোঝা যেত, কিন্তু এই হাসির অর্থ কী ? সেলিম স্পষ্টতই কেঁপে উঠলো।

টিনা সারা মুখে হাসিটা রেখে দিয়ে বললো, ওহে মাইম আর্টিস্ট, তোমার মুখখানা এখন যদি একবার আয়নায় দেখতে ! কী রকম দেখাচ্ছে জানো ? অবিকল চোরের মতন ! মুখখানা চোর-চোর, আর এদিকে বলছো, আই লাভ ইউ ? হি-হি-হি-হি..

দিশেহারা হয়ে সেলিম আবার টিনার হাত ধরতে গেল।

নাচের ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে, আরও দূরে সরে গিয়ে টিনা বললো, নো, নো, ডোন্‌ট বী আ নটি বয় ! আয়নার সামনে গিয়ে ভালো করে প্র্যাকটিস করো ! এক্সপ্রেশান একেবারে ঠিক হচ্ছে না।

এর পর ফোন বেজে উঠতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো টিনা।

grontheagar.weebly.com

এই ঘটনা শিখা-অনীশ জানে না। টিনা কিছু বলেনি। এমনকি ঘটনাটাকে সে তেমন গুরুত্বও দেয়নি। এর পরেও সে সেলিমের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলেছে।

অনীশ রোজই ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছে না সেলিমকে। একটা দামড়া ছেলে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকবে, তার জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, এটা সে সহ্য করতে পারছে না কিছুতে। শিখাও অনীশের মেজাজের ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। এই ভাবে কতদিন চলবে ?

এখন আর ছুটির দিনেও কেউ ব্রেকফাস্ট টেবিলে সেলিমের জন্য খাবার সাজিয়ে দেয় না। ফ্রিজ খুলে সে নিজের খাবার নিজেই নিয়ে নেয়। গ্যাস জ্বালিয়ে সে কিছু কিছু রান্নাও শিখেছে। রোজ রোজ দুপুরে তার স্যান্ডুইচ ভালো লাগে না, তাই সে ভাত ফুটিয়ে নেয়। আলু সেদ্ধ, ডিম ভাজা আর মাখন দিয়ে সে দুপুরবেলা মনের সুখে একা একা ভাত খায়। কাঁচালঙ্কার অভাবটা খুব অনুভব করে সে। এ দেশের লঙ্কায় ঝাল নেই। প্যারিসের ভিয়েতনামী বাজারে সে ঠিক দেশের মতন কাঁচা মরিচ পেত।

একদিন সেলিমের আর একটি অপরাধ অনীশের কাছে হাতেনাতে

ধরা পড়ে গেল !

মাঝরাতে বাথরুমে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছিল অনীশ, বসবার ঘরে একটা আলো জ্বলছে দেখে সে পা টিপে টিপে এলো। আর কেউ নেই, শুধু সেলিম কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে !

দেখেই গা জ্বলে গেল অনীশের। ছেলেটা লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন করে। নিশ্চয়ই ইন্টারন্যাশনাল কল। অনেক খরচ। শুধু খাওয়া-পরা নয়, তার ওপর আরও খরচের বোঝা চাপাচ্ছে।

কিছু একটা শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়েই ফোনটা রেখে দিল সেলিম।

অনীশ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ফোন করছিলে ? ঢাকায় ?

সেলিম পাংশু মুখে বললো, জী না। না, না। আমি কল করি নাই। একটা কল এসেছিল।

অনীশ বললো, তোমাকে কেউ ফোন করেছিল ? তুমি যে এখানে থাকো তা ঢাকার লোক জানে ?

সেলিম বললো, ঢাকার ফোন না। এইখানের।

—এখানে তোমাকে কে ফোন করেছিল ?

gronthagar.weebly.com

—আমাকে করে নাই। রিং হলো। আমি ধরলাম, রং নাম্বার। কিন্তু আমি বাঙালি শুনে সে কথা বলতে লাগলো আমার সঙ্গে।

—পুলিশ ? ইংরিজিতে কথা বলছিল ?

—জী না, বাংলায়। আমাকে চেনে না, আমিও চিনি না।

স্পষ্টই মিথ্যে কথা। অতি কাঁচা মিথ্যে। সেলিমের মুখ দেখেও বোঝা যায়। মুখে চোর-চোর ভাব।

অনীশ প্রচণ্ড একটা ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল। ভদ্রতাবোধ এক মহা জ্বালা। কোনো মানুষের মুখের ওপর কি তাকে মিথ্যেবাদী বলা যায় ?

ঘরে ফিরে এসে সে রাগে ফেটে পড়লো। ঘুমন্ত শিখাকে জাগিয়ে তুলে সে বললো, তোমার মামাবাবু মরে গিয়েও আমাদের এমন বিপদে ফেলে গেলেন ! তোমার পেয়ারের অতিথি ইন্টারন্যাশনাল কল করছে। আমাদের হার্ড আর্নড মানি যার-তার জন্য খরচ করতে যাবো কেন ?

শিখা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলো।

অনীশ দাপাদাপি করতে করতে বললো, আবার আমার মুখের ওপর মিথ্যে কথা বলে ! বাস্টার্ড ! আরও কত ফোন করেছে কে

জানে! এনাফ ইজ এনাফ! শোনো, কাল সকালেই আমি ওকে টিকিট কেটে নিউ ইয়র্ক পাঠিয়ে দেবো। সেখানে যা পারে করুক। আমি আর একদিনও ওর দায়িত্ব নিতে রাজি নই! ও এখন থেকে যেতে না চাইলে...আই উইল কিক্ হিম আউট!

॥ ৫ ॥

শনিবার শিখার কাপড় কাচার দিন। শনিবার অনীশের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালাবার দিন। টিনার পিয়ানো লেশ্‌ন নেবার দিন। মিকির জুতো পরিষ্কার করার দিন। ছুটির দিন, তবু সবারই কিছু না কিছু কাজ আছে। শুধু সেলিমের নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব নেই।

ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত আলস্য করা যেতে পারে। তার পরেই সাজ সাজ রব। ওই সব কাজ ছাড়াও গাড়ি পরিষ্কার, বাথরুম সাফ করা, পর্দা বদলানো, টেলিফোনে পরচর্চা, দেশে চিঠি লেখা, আরও কত কী থাকে। গ্রীষ্মকালে কাজ আরও বেশি থাকে, তখন অনীশকে বাগানের ঘাস কাটতে হয়।

কালকের প্রতিজ্ঞা ভোলেনি অনীশ, ঘুম থেকে উঠেই সে শিখাকে আবার বলেছে, আজই কিন্তু আমি ওই ছোকরাকে তাড়াবো, তুমি আমাদের কথার মধ্যে মাথা গলাতে এসো না।

শিখা কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। অনীশের মেজাজ যে-রকম গরম হয়ে আছে, কিছু বলতে গেলেই সে আরও কঠোর হয়ে উঠবে।

ইচ্ছে করেই যেন শিখা আজ ব্রেকফাস্টের সময়টাকে লম্বা করে দিল। লুচি বানাচ্ছে, সেই সঙ্গে বাঁধাকপি-কিমার তরকারি। তার ছেলে মিকি ভারতীয় খাবার পছন্দ করে না, ভাতের বদলে হ্যামবার্গার খায়, মাছের ঝোল ছুঁয়েও দেখে না, তার বদলে তাকে দিতে হয় ফিস অ্যান্ড চিপস্। শিখা মাঝে মাঝে রসগোল্লা কিংবা পায়েস বানায়, অনীশ খুব পছন্দ করে, কিন্তু ছেলে মুখে দিয়েও ফেলে দেবে, তার চাই অ্যাপ্‌ল পাই।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সে লুচি ভালোবাসে। গরম গরম লুচি খায় মধু মাখিয়ে। এই শহরের মধু খুব বিখ্যাত। এখানে প্রাকৃতিক মধুর বড় কারখানা আছে। অনীশ বলে, জানো শিখা, আমার বাবাও মধু দিয়ে লুচি খেতেন। মিকি তো আমার বাবাকে দেখেইনি কখনো। অথচ ঠাকুর্দার স্বভাবটা ও পেল কী করে? একেই বলে

বংশের ধারা।

লুচি-পর্ব শেষ হবার পর আবার চা। টিনা আর সেলিম একটা ফিল্ম বিষয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। গড ফাদার পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু'র মধ্যে কোনটা বেশি ভালো। এর মধ্যে ভিডিও ক্যাসেটে ওরা দুটো ছবিই দেখেছে।

শিখা মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে স্বামীর দিকে। কখন প্রসঙ্গটা তুলবে অনীশ? এখন সে চোখের সামনে একটা মেডিক্যাল জার্নাল মেলে আছে। মন দিয়ে পড়ছে না, বোঝাই যায়, তার ভুরু দুটো কোঁচকানো।

মিকি চা খায় না, সে আগেই টেবিল ছেড়ে উঠে গেছে। টিনাও এক সময় তর্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, পার্ডন মি, আমাকে একটা জরুরি ফোন করতে হবে।

এইবার, এইবার বলবে অনীশ, এই তো প্রকৃষ্ট সময়।

হঠাৎ শিখা একটা ভুল করে ফেললো। সে নিরীহ ভাবে সেলিমকে বললো, আজ জামা কাপড় মেশিনে দেবো। সেলিম, তোমার কিছু কাচবার আছে?

সেলিম বললো, ভাবী, আমাকে দ্যান না, আমি সব কেচে দেবো। আমি মেশিন চালাতে পারি।

granthagar.weebly.com

অনীশের গা জ্বলে গেল। আজ সেলিম চলে যাবে, আজ তার জামা-কাপড় এখানে কাচার কী দরকার? ড্রায়ারটা ভালো কাজ করছে না, কাচা জামা-কাপড় শুকোতে সারাদিন লেগে যাবে।

সে কটমট করে তাকালো শিখার দিকে। শিখা ভুল বুঝতে পেরে কাঁচুমাচু ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সেলিম অনীশকে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আজ সুপার মার্কেটে যাবেন নাকি? তা হলে আমিও আপনার সাথে যেতাম। আমার একটা টাওয়েল কিনতে হবে। আর মিকির কাছে দু'প্যাকেট চকোলেট বাজি হেরেছি।

অনীশ গম্ভীর ভাবে বললো, না আজ আর আমি বেরুবো না।

শিখা নিজে এতক্ষণে লুচি নিয়ে খেতে বসেছে। সে বললো, বেসমেন্টে অনেক তোয়ালে আছে। তার থেকে একটা নিলেই তো পারো। টিনাকে বোলো, ও বার করে দেবে।

সেলিম বললো, আপনারা তো মাথায় তেল মাখেন না। আমাকে মাঝে মাঝে মাখতে হয়।

শিখা বললো, দেশ থেকে আমি নারকোল তেল এনেছি। তোমার

যা ঘন চুল, তেল মাখা তো দরকারই। বাথরুমে দেখবে একটা নীল শ্যাম্পুর শিশিতে নারকোল তেল আছে।

অনীশের অসহ্য লাগছে। এই ধরনের কথাবার্তার মানে যেন, ওই ছেলেটা চিরকাল এ বাড়িতে থাকবে। শিখা তার চোখের দিকে চোখ ফেলছেই না।

একটু বাদে সেলিম উঠে গেল টিভি'র কাছে।

শিখা মনে মনে অনীশকে বললো, এবার যাও, ওখানে তো আর কেউ নেই। যা বলতে চাও বলে ফেলো ওকে।

অনীশও উঠে দাঁড়ালো, বসবার ঘরের দিকে গেল কয়েক পা, তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ায় যেন দ্রুত ঢুকে গেল নিজের ঘরে।

দিনের প্রথম সিগারেটটি ধরিয়ে শিখা এখন হাসছে। শিখার কাছে যতই তর্জন গর্জন করুক, অনীশও মুখ ফুটে বলতে পারছে না আসল কথাটা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনীশ বললো, সেলিম শোনো—

সেলিম বললো, কী, বলেন দাদা।

শিখা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকালো। এইবার এইবার।

অনীশ বললো, ইয়ে, তুমি টিভি-টা একটু আস্তে করে দেবে? আমাকে একটা ফোন করতে হবে।

সেলিম বললো, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি!

শিখা আবার আপন মনে হাসলো।

বসবার ঘরে, বেড রুমে, বেসমেন্টে, বাথরুমে ফোন ছড়ানো। অনীশ রিসিভার তুলে দেখলো, বেসমেন্টের ফোনে টিনা এখনো কথা বলে যাচ্ছে।

অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলো অনীশ। একটু পরে টিনা উঠে এলো ওপরে। তখন আর অনীশের ফোনের কথা মনে নেই। স্বামী আর স্ত্রী শুধু অনুভব করছে টেনশান, অন্যরা বুঝতে পারছে না কিছুই। টিনা সেলিমকে কী একটা ঠাট্টা করে হাসছে খুব।

হঠাৎ অনীশ জুতো-মোজা পরতে লাগলো। গায়ে চাপিয়ে নিল একটা উইন্ডচিটার।

শিখা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই যে বললে তুমি আজ আর বেরুবে না?

অনীশ অন্যমনস্ক ভাবে বললো, একটু বাগানে যাচ্ছি।

বাড়ির সামনে-পেছনে যে-টুকু জমি আছে, তাতে গ্রীষ্মকালে বেশ ফুল ফোটে, একটা আপেল ও চেরি গাছও আছে। বেগুন-টোমাটোও

growthinglive.weebly.com

হয়। কিন্তু শীতকালে বাগান বলতে কিছুই থাকে না। বরফে ঘাসও চাপা পড়ে যায়। তবে, অদ্ভুত ব্যাপার, একবার লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে অনীশ কোরিয়ানদের দোকান থেকে একটা লঙ্কা গাছের চারা এনেছিল, সেই লঙ্কা গাছটা কিন্তু শীতকালেও বেঁচে আছে, লঙ্কাও ফলেছে। অনীশ মাঝে মাঝে সেই গাছটার যত্ন নেয়। সে নিজে অবশ্য কাঁচা লঙ্কা খায়ই না, গাছটাকে বাঁচানোই বড় কথা।

গেটের সামনে এসে থামলো একটা মার্সিডিজ গাড়ি। ভেতরে একলা আলম সাহেব।

এখানকার চেনাশুনোদের মধ্যে ইনিই একমাত্র ব্যক্তি, ফোন না করেও যে কোনো সময় হুট করে চলে আসতে পারেন। সেটা এঁকে মানায়।

গাড়ি থেকে নেমেই আলম সাহেব বললেন, থার্ড হ্যান্ড। ভাববেন না হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছি! শস্তায় পেয়ে কিনে ফেললাম।

অনীশ এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা দেখতে লাগলো। তার একটা মার্সিডিজ কেনার ইচ্ছে আছে, তবে পুরনো নয়, হাতে কিছু টাকা জমুক নতুনই কিনবে!

আলম সাহেব বললেন, শিকাগো গেছিলাম ব্যবসার কাজে।
granthagar.weebly.com
প্রত্যেকদিন একটা গাড়ি ভাড়া করতে হতো। একদিন দেখি একটা পার্কিং লটে এই গাড়িটার গায়ে 'ফর সেল' ঝোলানো। দরদাম করতে গিয়ে দেখলাম, থ্রো অ্যাওয়ে প্রাইস। কিনে ফেললাম।

গাড়িটার দাম ও দোষ-গুণ নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে আলম সাহেব বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে খারাপ লোক ভাবছেন। দিন-কুড়ি যে শিকাগোতেই কাটাতে হলো।

অনীশ বললো, আপনাকে হঠাৎ খারাপ লোক ভাববো কেন?

আলম সাহেব বললেন, আপনার মামাবাবু মারা গেলেন। তখন আমরা কোনো খোঁজ খবর নিলাম না। আমার মিসেসও তো ছিল না এখানে। খবর পেয়েছি অনেক পরে।

অনীশ বললো, আমার মামা নন, শিখার মাথা। বুঝেছিলাম, আপনারা এখানে নেই। থাকলে নিশ্চয়ই একটা ফোন অন্তত করতেন।

আলম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, সেই ছ্যামরাটা কই: পালাইছে, না আছে?

অনীশ ঠিক বুঝতে না পেরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—প্রফেসার মিত্র যে ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিলেন ম্যাজিক না কী

যেন দেখায়, সে কোথায় ?

—সেলিম ? সে এখানেই আছে।

—এখানে মানে কোথায় ?

—ভেতরে আছে, ডাকবো ? আপনি তো ভেতরেই যাবেন !

—আহাম্মক ! সে এতদিন ধরে আপনার বাড়িতে পড়ে আছে ? একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারেনি ? কোনো বাংলাদেশীর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি কেন ?

—মামাবাবুর হঠাৎ ওরকম হয়ে গেল, সেলিম খুব আপসেট হয়ে পড়েছিল।

—শোনেন মশাই, ছেলেটার জন্য আমি একটা চাকরি জোগাড় করেছি। ওকে আজই নিয়ে যাবো। আপনার বাড়িতে দিনের পর দিন বসে বসে খাবে, এ কী অন্যায় কথা।

অনীশ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে কে কথা বলছে, আলম সাহেব না কোনো দেবদূত ? এমন অলৌকিকভাবে এত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?

সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, ওর জন্য চাকরি জোগাড় করেছেন ? কোথায় ?

gronthagar.weebly.com

আলম সাহেব বললেন, আমাদের পাশের শহর বাস্টিড-এ। একটা রেস্তোরাঁয়। খাওয়া ফ্রি, কিছু মাইনেও পাবে।

—কিন্তু ওর যে ওয়ার্ক পারমিট নেই। ভিসাও শেষ হয়ে আসছে !

—গুলি মারুন। সে ওরা বুঝবে। রেস্তোরাঁর এক পার্টনার হারুন আমার খুব বন্ধু। সে তালেবর লোক। এই সব ইললিগ্যাল ইমিগ্র্যান্টসদের দিয়ে শস্তায় কাজ করায়। পুলিশকে ম্যানেজ করে। আপনার কোনো চিন্তা নাই।

—থাকবে কোথায় ?

—সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। ওখানেই কাজ করে তিন-চারটি ছেলে একটা বেসমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকে। সেখানে সেলিম ভিড়ে যাবে। পঞ্চাশটা ডলার মোটে লাগবে।

অনীশের বুক খালি করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। আলম সাহেব কী যে উপকার করলেন, তা তিনি নিজেও বুঝবেন না। শিখার কাছে ছোট হতে হলো না অনীশকে।

আলম সাহেব বললেন, আমার গাড়িতে উঠে আসেন তো স্যার। সেলিমের সাথে পরে কথা বলবো। এই গাড়িটা একবার চালিয়ে

দেখেন তো। আপনি এক্সপার্ট, একটা ওপিনিয়ান দ্যান। চলেন, একটা রাউন্ড দিয়ে আসি।

অনীশ স্টিয়ারিং-এ বসে আগে ড্যাস বোর্ডটা দেখে নিল ভালো করে। তার নিজের না থাক, তার অফিসের একটা মার্সিডিজ আছে, সেটা সে কয়েকবার চালিয়েছে।

স্টার্ট দেবার পর সে বললো, পিক আপ ভালো। কিন্তু দু-একটা ছোটখাটো কাজ করাতে হবে।

আলম সাহেব বললেন, সাইলেন্সার ঠিক নেই।

অনীশ বললো, স্টিয়ারিং একটু হার্ড।

আলম সাহেব বললেন, এই স্টিয়ারিং-এই তো শিকাগো থেকে চালিয়ে আসলাম। এই-ই চলুক। ওটা অ্যাডজাস্ট করতে অনেক খরচ পড়ে যাবে।

অনীশ পঞ্চান্ন মাইল স্পীড তুলে দিল। এই সব গাড়ি একশো মাইল স্পীডে চালাবার জন্য তৈরি। কিন্তু পঞ্চান্নর বেশি তুললেই পুলিস ধরবে। অনীশ রাস্তাটা ফাঁকা দেখে ষাট, পঁয়ষট্টি পর্যন্ত তুললো, গাড়িটা একটু কাঁপছে।

সে তাকালো আলমের দিকে। আলম হাসলেন। অর্থাৎ গাড়ির দুর্বলতাগুলো তিনি জানেন। তবু তো মার্সিডিজ।

টার্ন পাইক পর্যন্ত গিয়ে ফেরার পথে অনীশ বললো, বাইরে এসে ভালোই হলো। আলম সাহেব, আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার। মামাবাবু আমাদের বলে গিয়েছিলেন, আমরা আর কারুকে এ পর্যন্ত বলিনি। সেলিম এমনিতে বেশ ভালো ছেলে। ব্যবহার খুব ভদ্র। কিন্তু দেশে ওর নামে একটা মার্ডার চার্জ আছে। ঢাকায় ফিরলেই পুলিস ওকে ধরবে!

আলমের মুখখানা ছাইবর্ণ হয়ে গেল।

বেশ কয়েক মুহূর্ত অনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বললেন, মার্ডার চার্জ? কাকে খুন করেছে?

অনীশ বললো, ও নিজের হাতে কারুকে খুন করেছে, এটা আমাদের কারুরই বিশ্বাস হয়নি। ওর নেচারটাই সেরকম নয়। দু'দল ছাত্রদের মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। একটি ছাত্র মরেই গেছে, পুলিস ওকেই খুনী বলে আইডেন্টিফাই করেছে।

আলমের মুখখানা আবার বদলে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওঃ, পলিটিক্যাল মার্ডার! আমাদের বাংলাদেশে যে-কোনো স্টুডেন্টের নামে ইচ্ছা করলেই ওই

চার্জ দেওয়া যায়, আবার একটু ম্যানিপুলেট করলে ওই চার্জ তুলেও নেওয়া যায়। ওর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে? সে তো ভালো ব্যাপার। জানেন, অনেক ছেলে ইচ্ছে করে পুলিসের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধিয়ে কয়েক দিন জেল খাটে। সেই জেল খাটার রেকর্ড তো অ্যাসেট। সেলিম মরতে আমেরিকায় এলো কেন? জার্মানি কিংবা সুইডেনে গেলে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম চেয়ে দিব্যি আরামে থাকতে পারতো!

—ও কাগজপত্র প্রমাণ কিছু আনেনি। জীবনমামা খোঁজ নিয়েছিলেন।

—গাধা আর কাকে বলে! এরকম চান্স কেউ মিস করে? একটা কিছু ডকুমেন্ট থাকলে পলিটিক্যাল ভিকটিম হিসেবে কানাডাতেও ঢুকে যেতে পারতো!

—নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর এই ব্যাপারটা যে আমরা জানি, তা কিন্তু ওকে জানাইনি।

—আমাকে জানিয়ে ভালো করেছেন। আমি ডিসক্রিটলি ঢাকাতে খোঁজ খবর নেবো। বিয়ে-শাদি করেছে নাকি?

—ঠিক জানি না। যতদূর মনে হয়, করেনি।

—সুরতখানা তো বেশ ভালো। এখানে অনেক পাত্রী জুটে যাবে।

grontHagar.weebly.com

বাড়ির দরজার সামনে আবার গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো শিখা। তার সারা মুখে উৎকণ্ঠা। অনীশ কিছু না জানিয়ে চলে গেছে।

কাছে এসে শিখার কাঁধে হাত দিয়ে নিচু গলায় অনীশ বললো, প্রবলেম সলভ্‌ড।

ভেতরে ঢুকে আলম উঁচু গলায় বললেন, সেলিম, সেলিম কোথায় রে? পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নে। আমার সঙ্গে যেতে হবে, বেশি দেরি করতে পারবো না।

সেলিম নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। চাকরির প্রস্তাবটা শোনানো হলো তাকে। তার মতামতের কোনো প্রশ্ন নেই। সে তো স্বাধীন নয়। দূর বিদেশে সে এক নিঃস্ব যুবক, অন্যের দয়ায় তাকে থাকতে হচ্ছে। সে বসে গেল ব্যাগ গুছোতে।

বেসমেন্টে পিয়ানো বাজছে। কয়েক দিন আগেই একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো ভাড়া করা হয়েছে, মিসেস পিগট আসেন টিনাকে শেখাতে।

অন্যরা কথা থামালে পিয়ানোর টুং-টাং শব্দে বেশ একটা আবহ

তৈরি হয়ে যায়।

শিখা চা নিয়ে এলো, আলম কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, প্রফেসার জীবনময় মিত্তিরের কী ভাগ্য! দেশ পার্টিশান হয়ে গেল, আত্মীয়-স্বজন সব চলে গেল ইন্ডিয়ায়, উনি জন্মভূমির মাটি কামড়ে রয়ে গেলেন। বাংলাদেশটাকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু মরার সময় তিনি দেশের মাটি পেলেন না।

হঠাৎ জল এসে গেল শিখার চোখে। সেটা চাপার জন্য সে একটা তুচ্ছ কথা বললো।

—জানেন, জীবনমামা আমার হাতের রান্না ট্রাউট মাছ খেতে চেয়েছিলেন। সেটা খাওয়াতে পারলাম না।

—ওঁর তো ছেলেপুলে কেউ নেই? ওঃ আই অ্যাম সরি, উনি নিজেই সেদিন বলেছিলেন, বিয়ে করেননি। সেলিমকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই ছাত্ররাই আমার সন্তান। আমরা মশাই সংসারী মানুষ, নিজেদের ছেলেপুলে নিয়েই জেরবার হয়ে আছি! আপনার মামার তো সেরকম কিছুই বয়েস হয়নি।

—আমার মায়ের থেকেও ছোট।

আলম চুপ করে গেলেন। মৃত্যু সম্পর্কে বেশি আলোচনা করার রীতি নেই এদেশে। জীবনময়ের মুখখানা তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন। যে ছাত্রের নামে মার্ডার চার্জ আছে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন ওই অধ্যাপক। কিন্তু তিনি নিজে বাঁচতে পারলেন না। হঠাৎ আলমের খেয়াল হলো, তিনি যে সোফায় বসে আছেন, ঠিক এখানেই তিনি লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরা জীবনময়কে বসে থাকতে দেখেছিলেন।

সশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আমায় যে এবার যেতে হবে। কই রে সেলিম, আয়, আয় বাবা!

সেলিম নিজের ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুত। ঝুপ করে শিখার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো সে। শিখা একটিও কথা বললো না।

অনীশ একটু পিছিয়ে গিয়ে আগে থেকেই বললো, না, না, আমায় ওসব করতে হবে না। মাঝে মাঝে এসো আমাদের এখানে। ফোন কোরো।

তারপর সে পকেট থেকে একশো ডলারের নোট বার করে বললো, এটা রাখো তোমার কাছে!

সেলিম প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললো, না, না, লাগবে না, লাগবে না আমার!

granthagar.weebly.com

শিখা তীব্র চোখে তাকালো সেলিমের দিকে।

একটু আগে সে জোর করে সেলিমের পকেটে তিনশো সত্তর ডলার গুঁজে দিয়েছে, এবং ওই কথাটা কারুকে বলতে নিষেধ করেছে। মৃত্যুর আগে জীবনময়ের কাছে ওই ক্যাশ টাকাগুলো ছিল, শিখার বারবার মনে হতো, ওই টাকা সেলিমেরই প্রাপ্য।

আলমও বললেন, টাকা ওর লাগবে না অনীশভাই। সব ব্যবস্থা হয়ে আছে।

সেলিম অনীশের দিকে তাকিয়ে মিনতি ও অনুমতি চাইবার সুরে বললো, টিনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি ?

অনীশ বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কয়েক মুহূর্তে সবাই চুপ, শুধু শোনা যাচ্ছে পিয়ানোর শব্দ। চলচ্চিত্রের কোনো কোনো দৃশ্যে এ রকম আবহসঙ্গীত বাজে।

বেসমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সেলিম। মাত্র কয়েক দিনেই টিনা বেশ মনোযোগী ছাত্রী হয়ে উঠেছে। মিসেস পিগট একটু গোমড়া ধরনের, তাকে দেখলে ভয় ভয় করে।

টিনা সেলিমের দিকে তাকাচ্ছেই না।

এই সময় ডাকাডাকি করাটাও বোধহয় ঠিক নয়। সেলিম অস্বস্তিতে পড়লো। আলম সাহেব ব্যস্ত হয়ে আছেন। এদিকে সে টিনার সঙ্গে একটা কথাও না বলে চলে যাবে ?

মিসেস পিগটই সেলিমকে দেখে টিনাকে কিছু বললো।

টিনা চোখ তুলে বললো, কী ব্যাপার, কাঁধে ব্যাগ কেন, কোথাও যাচ্ছো ?

সেলিম বললো, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে গুড বাই জানাতে এলাম।

টিনা পিয়ানো ছেড়ে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, চলে যাচ্ছো মানে ?

সেলিম বললো, আলম সাহেব আমার জন্য চাকরি জোগাড় করেছেন। সেখানে যাচ্ছি। আর বোধহয় দেখা হবে না !

হাত বাড়িয়ে সে টিনার কাঁধ ছুঁয়ে দিল।

টিনা ভুরু কুঁচকে বললো, চাকরি পেয়েছো ? সে তো আনন্দের কথা। মুখখানা বেগুনভাজার মতন করে আছো কেন ? আমি ভাবলাম, তোমাকে বুঝি পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই ধরনের কথা শুনলে সেলিম একেবারে গুটিয়ে যায়। কোনো উত্তরই খুঁজে পায় না।

টিনা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, তোমাকে আগে একদিন বলেছিলাম না, তোমার এক্সপ্রেশান ঠিক হচ্ছে না! তুমি না শিল্পী?

নিজের কাঁধ থেকে সেলিমের হাতটা সরিয়ে, সেই হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, উইশ ইউ গুড লাক! হ্যাভ আ নাইস জার্নি!

তারপর সে পিয়ানোতে ফিরে গিয়ে দু'বার বেশ জোরে ঝঙ্কার দিল।

॥ ৬ ॥

আলম সাহেব সেলিমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন না। তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তাছাড়া তাঁর শাশুড়ি কিছুদিন ধরে আছেন, বাড়িতে একেবারে জায়গা নেই। সোজা গাড়ি চালালেন বাস্টিড শহরের দিকে।

যেতে যেতে বললেন, শোন সেলিম, আমি তোরে কয়েকটা উপদেশ দেবো। এই কয়দিনে নিশ্চয়ই বুঝেছিস, এই দেশে লাইফ খুব টাফ। খেটে খেতে হয়। কাজে ফাঁকি দিলেই এরা লাথথি মারে। এ দেশে ডিগনিটি অফ লেবার আছে, যা আমাদের দেশে নাই। কোনো কাজকেই এরা ঘেন্না করে না।

gronthagar.weebly.com

সেলিম বললো, জানি। প্যারিসেও দেখেছি।

—প্যারিসে তো তুই শুধু ইন্ডিয়ান আর বাংলাদেশীদের দেখেছিস। ফ্রেঞ্চদের সাথে মিশেছিস? তারা বিদেশীদের সাথে সহজে মেশে না। আমেরিকানরা মেশে। কালো বলে মনে মনে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব থাকলেও বাইরে তা দেখায় না। কেউ কেউ আবার কালোদের ওপর বেশি বেশি সহানুভূতি দেখায়। সে কথা থাক। সে সব তুই নিজেই বুঝে যাবি। এখানে দেখবি, ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রীরাও লোকের বাগানে পার্ট টাইম মালির কাজ করে, রেস্টুরেন্টে বর্তন মাজে, বেবি সিট করে। পয়সার জন্য যে-কোনো কাজ করতে পারে।

—টিভি-তে দেখেছি। ঢাকাতেও আমরা ডালাস সিরিয়ালটা দেখতাম।

—বেশ! তোকে যে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে তোকে প্রথম প্রথম টেবিল পরিষ্কার আর হাঁড়ি-কড়াই মাজার কাজ দেবে। মুখ বুজে সেই কাজ করে যাবি মন দিয়ে। ভালো কাজ করলে উন্নতি হবে। ডেইলি ওয়েজ দেবে দশ ডলার, খাওয়া ফ্রি, খুব খারাপ না।

—জী, ওতেই আমার চলে যাবে।

—দ্যাখ, প্রথম এসে আমিও এদেশে রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি, ট্যাক্সি চালিয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা আছে। তোকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে দু'জন এদেশি ব্ল্যাক, তিনটে সাদা মেয়ে, গ্রীক আর স্প্যানিশ অরিজিন, আর ছয় সাত জন বাংলাদেশী-পাকিস্তানী কাজ করে। কলেজ হস্টেলে যে-রকম র‍্যাগিং হয়, এখানেও প্রথম প্রথম ওরা তোর ওপর নানা রকম অত্যাচার করবে। বাংলাদেশীরাও করবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখবি। তুই সিগারেট খাস ?

—না, মানে, না, খাই না।

—বাজে কথা বলিস না। আগের দিন তোকে বাথরুমে গিয়ে সিগারেট টানতে দেখেছি। আমার সামনে খেতে পারিস। কিন্তু সাবধান, রেস্টুরেন্টে ডিউটির সময় একেবারে খাবি না। অ্যাবসলিউটলি প্রহিবিটেড। বাথরুমে গিয়ে দু'টান দিলেও তোর কলিগ্‌রা বুঝে যাবে, তাতে তোর লাইফ হেল হয়ে যাবে! মনে থাকবে ?

—জী, ডিউটির সময় স্মোক করবো না। একেবারে ছেড়েই দেব ভাবছি।

gronthagar.weebly.com

—অফ টাইমে টিভি দেখবি। যখনই সময় পাবি টিভি দেখবি। মন দিয়ে দেখবি, ছবি কিংবা গল্পের টানে ভুলবি না, কথাগুলো শুনবি। হাঁ করে গিলবি। তাতে এখানকার ভাষা শিখতে সুবিধা হবে, অ্যাকসেন্ট পিক আপ করতে পারবি। ঢাকায় যে ইংরাজি শিখেছিস, তা এখানে চলবে না। তোর তো চেহারা ভালো, মুখখানা হাসি হাসি করে রাখবি, তাতে অনেক ভুলচুক মাফ হয়ে যাবে।

আলম ওর নামে খুনের অভিযোগের প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপন করলেন না।

উপদেশ দেওয়া বন্ধ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন ওই বাড়িতে ছিলি, কী রকম ব্যবহার করেছে ? ঠিক মতন খেতে টেতে দিয়েছে ?

সেলিম বললো, না, না, অসুবিধা কিছু হয়নি। ফ্রিজ খুলে আমি ইচ্ছা মতন খাবার নিয়েছি, ওঁরা কিছু বলেননি। ভাত রান্না করেছি।

—হিন্দু বাড়িতে থাকলি, ওদের ব্যবহার ঠিক ছিল ?

—শিখা ভাবী চমৎকার মানুষ, আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন....তবে অনীশদাদা....মাঝে মাঝে মুখটা ব্যাজার করে থাকতো, বোধহয় আমাকে পছন্দ করতো না।

—অনীশটা একটা অড ক্যারেকটার। ওর সঙ্গে কারুর বন্ধুত্ব হয় না। শিখার জন্যই সবাই ও বাড়িতে যায়। শী ইজ আ রিয়েল লেডি। আর ওই টিনা, সে কী রকম ব্যবহার করতো ?

—ওকে ঠিক বোঝা যায় না। এক এক সময় বেশ গল্প করতো আমার সাথে, আবার এক এক সময় কথা বললেও উত্তর দিত না !

আলম হাহা করে হেসে উঠে বললেন, ওই বয়সের মেয়েদের মন বোঝা খুবই শক্ত। টিনা খুব শার্প, পুরুষদের নিয়ে খেলাতে জানে। দেখিসনি, ওই হেমাঙ্গ বোসটাকে কেমন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে ?

—টিনার একটি চাইনিজ বয় ফ্রেন্ড আছে। রোজ তার সঙ্গে কলেজ যায়।

—আরও কত বয় ফ্রেন্ড হবে !

আলমের গাড়ি এবার একটা ব্রিজের মুখে টোল দেবার জন্য থামাল।

সেন্ট হেলেন আর বাস্টিড একেবারে পাশাপাশি শহর। মাঝখানে একটা ছোট নদী। বাস্টিডে অফিস-দোকানপাটের সংখ্যা বেশি। এখানকার ভারতীয় রেস্তোরাঁটির নাম 'আগ্রা'। তাজমহল নামটা রাখা যায়নি, কারণ সে নামে আর একটি রেস্তোরাঁ-চেইন আছে।

gronthogar.weebly.com

'আগ্রা' যদিও ভারতীয় রেস্তোরাঁ, কিন্তু এর দু'জন মালিকের মধ্যে একজন পাকিস্তানী, অন্যজন বাংলাদেশী। এদের দোকানটিকে এরা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ বলতে বাধ্য হয়েছে, কারণ ইউরোপ-আমেরিকায় এখনো পাকিস্তানী খাবার কিংবা বাংলাদেশী খাবার বলে কোনো রান্নার পরিচিতি নেই। চীনে খাবার বললেই যেমন চেনা যায়, সেরকম পোলাও-কোর্মা-বিরিয়ানি-ডাল-ভাত-পাঁপড় এইসব শুনলেই এখানকার লোক ভাবে ভারতীয় খাবার। পাকিস্তানের কোনো গায়ক এসে খেয়াল-ঠুংরির অনুষ্ঠান করলেও বলা হয় ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক, কারণ পাকিস্তানী মিউজিক বলে আলাদা কিছু এখনো এরা চেনে না। পাকিস্তান আর বাংলাদেশ যে এখনো ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টের অন্তর্গত, তা বিদেশে বসে মেনে নিতেই হয়। অবশ্য হোটেল ব্যবসা কিংবা গান-বাজনার ব্যাপারে ভারতীয় পাকিস্তানী-বাংলাদেশীরা মিলেমিশেই থাকে এখানে, কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই। পাকিস্তানী গায়কের সঙ্গে স্থানীয় ভারতীয় তবলাবাদক ধার করা হয়, ভারতীয় মালিকানার হোটেলে বাংলাদেশী রান্নার পাচক কাজ করে। আগ্রা হোটেলের প্রধান রাঁধুনি একজন পঞ্জাবি হিন্দু।

'আগ্রা'র অন্যতম মালিক হারুন আলমের বন্ধু, কিন্তু সে এখন হোটেলে উপস্থিত নেই। পাকিস্তানী মালিকটিকে আলম চেনেন না, তাঁকে কিছু বললেনও না। একটা টেবিল দেখে বাইরের খদ্দেরের মতন তিনি বসে খেলেন সেলিমকে নিয়ে।

প্রথমে দু' বোতল বীয়ারের অর্ডার দিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন মিনিউ কার্ড।

সেলিম ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। রেস্তোরাঁটি বেশ বড়, প্রায় কুড়িটি টেবিল। যথাসম্ভব প্রাচ্য পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু বেদিতে কাচ দিয়ে ঢাকা তাজমহলের একটি রেপ্লিকা, সেটার ভেতরে আবার টুনি বাল্ব জ্বলছে। ঢুকেই সেটা চোখে পড়ে, কিন্তু তার পেছনে একটা অ্যাকোরিয়াম রাখাটা একেবারে মানায়নি। দেওয়ালে গুরু নানক, জিন্না, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শেখ মুজিবের বাঁধানো ছবি, এক কোণে একটা বিশাল নটরাজের মূর্তি, আর একদিকে গৌতম বুদ্ধ ! একেবারে সর্বধর্ম সমন্বয় ! ওয়াল পেপারে নানারকম পাখি, শুধু একটা দেয়ালে কারুর কাঁচা হাতে আঁকা ওমর খইয়াম ও সাকি, অদূরে আরও দুটি ঘাগরা-কাঁচুলি পরা নারী।

gronthogar.weebly.com

সেলিমেরই বয়েসী একটি ছেলে টেবিলের কাছে এসে বললো, গুড আফটার নুন স্যার। মে আই টেক ইয়োর অর্ডার ?

আলম সাহেব চেয়ারে এলিয়ে বসে আছেন। বীয়ারের গেলাসে একটা চুমুক দিয়েছেন মাত্র। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, চেইঞ্জ দা গ্লাস !

ছেলেটি গেলাসটি তুলে ভালো করে পরীক্ষা করলো। একটা সূক্ষ্ম ফাটা দাগ রয়েছে। বিব্রত ভাবে বললো, আই অ্যাম সরি স্যার !

প্রায় ছুটে গিয়ে সে আর একটি নতুন গেলাসে বীয়ার ভরে নিয়ে এলো।

আলম আবার ইংরিজিতে বললেন, প্রথমে দু' প্লেট রেশমি কাবাব নিয়ে এসো। পরে বাকি অর্ডার দেবো।

একেবারে নিষেধ। অন্য কাস্টোমাররা বিরক্ত হয়!

আলম তিন বোতল বীয়ার ও অনেক রকম খাবার দাবার নিলেন। রীতিমতন ভোজ হলো। সব শেষ হলে তিনি কাউন্টারের দিকে হাত তুলে বললেন, চেক!

তারপর আলমকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললাম, বুঝলি? এ দেশে বিল বলে না, সেটাই চেক। আবার ব্যাঙ্কের টাকা তোলার জন্যও চেক। 'রেইন চেক' কাকে বলে জানিস? পরে আস্তে আস্তে শিখে যাবি।

মাহবুব চেক এনে দিল। আলম জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে ব্যাঙ্কের চেক বই বার করে যখন টাকাটা লিখতে যাবেন, তখন একজন তার পেছনে এসে ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, ওটা থাক।

লোকটির গায়ের রং কুচকুচে কালো, লম্বা, মাথার চুল কদম ছাঁট, ঘি রঙের সুট পরা, বাঙালি বলে চেনাই যায় না, মনে হয় এদেশি কালো মানুষ। নিগ্রো শব্দটা এখন আর কেউ ব্যবহার করে না।

এই লোকটিই হারুন। সে একটি চেয়ারে বসে পড়ে বিলটি তুলে নিয়ে বললো, অন দা হাউজ!

আলম বললেন, না, না, আমি পে করবো। আই ইনসিস্ট!

grontha

তিনি খসখস করে চেক লিখলেন। সেটা বাড়িয়ে দিলেন মাহবুবের দিকে। মাহবুব দ্বিধা করছে, হারুন সেটাও নিয়ে বললো, ঠিক আছে, আমার কাছে রইলো।

অন্য খদ্দেরদের ভিড় কমে গেছে। রেস্তোরাঁ প্রায় ফাঁকা। লাঞ্চের সময় শেষ হয়ে গেছে। হারুন বললো, কী খাচ্ছিলেন, বীয়ার? আর এক বোতল হোক।

আলম বললেন, না, যথেষ্ট হয়ে গেছে। আর দেরি করে ফিরলে তোমার হাসিনা ভাবী আমায় পিট্টি দেবে! শোনো, এই হচ্ছে সেলিম। আজ থেকেই কাজে লাগাও।

হারুন তীক্ষ্ণ চোখে সেলিমকে আপাদমস্তক দেখলো। তার চোয়াল দুটো কঠিন, মনে হয় মায়াদয়াহীন মানুষ। টাকা উপার্জনের নেশায় মেতে আছে।

সে সেলিমকে বললো, দেখি মিঞা, ডাইন হাতখান দেখি।

সেলিম ডান হাত এগিয়ে দিল ইস্কুলের ছাত্রের মতন।

তার ফর্সা হাত টিপেটুপে দেখলো হারুন। তারপর বললো, নরম। মাইয়া মানুষের মতন। পারবে? বড় বড় বর্তন মাজতে পারবে ও?

আলম সেলিমের চোখের দিকে তাকালেন। সেলিম সঙ্গে সঙ্গে বললো, জী পারবো। সব কাজ পারবো!

আলম সাহেব হেসে বললেন, মেয়েরা নরম হাতেই তো বাসন মাজে। তারা ভালো পারে।

হারুন রসিকতার ধার ধারে না। সে চাঁছাছোলা গলায় বললো, দুটো পয়েন্ট আছে। শীতের সময় লীন সিজ্ন, লোক নেওয়ার দরকার ছিল না। তবু নিতেছি আলম সাহেবের অনুরোধে। আমি যখন প্রথ্থম আসি, আলম সাহেব সাহায্য না করলে আমি সারভাইভ করতে পারতাম না। তুমি থাকো, মন দিয়ে কাজ-কাম করো। সেকেন্ড পয়েন্ট, আমার পার্টনার জুলফিকার রগচটা মানুষ। কাজে ভুল হলে সে সকলকেই গালি দেয়।

বাহানচোত আর ব্যাসটার্ড তার মুখে লেগেই আছে। হি ডাজ নট মিন ইট, ওগুলো কথার লবজ। প্রথম প্রথম তোমার গায়ে লাগবে, কিন্তু মেনে নিতে হবে। মানুষটা খারাপ না, স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড।

আলম বললেন, গালাগালির মানে ধরতে নেই। আসলে এখানে বন্ধু বান্ধবদেরও বলে, ইউ বাস্টার্ড। তা হলে সেলিম এ বেলা থেকেই লেগে পড়ুক।

হারুন বললো, না, একটু ওরিয়েন্টেশান দরকার। আমি মাহবুবকে বলে দিচ্ছি, আজ ওদের সাথে থাকুক। চেনাশুনা হোক। কাল সকাল থেকে জয়েন করবে।

আলম নিজের একটা কার্ড বার করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করিস। ঘাবড়াও মৎ বেটা। গুড লাক!

মাহবুবের ডিউটি শেষ, সে সেলিমকে নিয়ে গেল।

আগ্রা রেস্তোরাঁ থেকে দুটো ব্লক দূরে একটা বাড়িতে অনেক ভাড়াটে। সেখানকার বেসমেন্টের ঘরে মাহবুবরা থাকে পাঁচজন। সেলিমকে নিয়ে ছ'জন হলো। ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই, রেল স্টেশনের নিচু শ্রেণীর ওয়েটিং রুমের মতন মেঝেতে পাশাপাশি পাঁচটি বিছানা পাতা। দিনের পর দিন এরকম পাতাই থাকে, চাদরগুলো নোংরা হয়ে গেছে। এ ঘরে দিনের বেলাতেও বাতি জ্বালাতে হয়।

সেলিমের মনটা হঠাৎ দমে গেল। নামেই আমেরিকা, কিন্তু এটা যেন বস্তির ঘর। সেলিম কখনো এরকম দম-বন্ধ ঘরে থাকেনি। প্যারিসে সে শুধু একজনের সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকতো, সে ঘর এর থেকে অনেক ভালো।

granthagar-weekly.com

ওয়ার্ডরোবের বদলে এক কোণে একটা পর্দা টাঙানো, তার পেছনে সবাই জামা-কাপড় রাখে। মাহবুব সমস্ত পোশাক, এমনকি জাঙ্গিয়া পর্যন্ত খুলে ফেললো সেলিমের দিকে পেছন ফিরে, সেই দিগম্বর অবস্থায় গেল বাথরুমে। ফিরে এসে একটা লুঙ্গি পরে ধপাস করে শুয়ে পড়লো একটা বিছানায়। আপন মনেই বললো, খুব টায়ার্ড। আমি একটু ঘুমিয়ে নেবো। তুমি যে-কোনো বিছানায় শুতে পার।

অন্যের বিছানায় শোওয়ার অভ্যাস নেই সেলিমের। তার নিজেরও বিছানা নেই। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। শিখাদের বাড়িতে তার বিছানার চাদর বদলানো হতো প্রতিদিন।

একটা চেয়ারও নেই এ ঘরে। প্রথম কিছুক্ষণ বোকার মতন সে দাঁড়িয়েই রইলো। গোটা দু'এক প্যাকিং বক্স রয়েছে এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে, একটু পরে তারই একটিতে বসে জুতো খুলতে লাগলো সে। এ ঘরের মধ্যে কী রকম একটা ভ্যাপসা গন্ধ, কোনো দিন জানলা খোলা হয় না, সেলিমের বমি বমি ভাব আসছে। এখানে সে দিনের পর দিন কাটাবে কী করে?

ঘুমোতে ঘুমোতেই মাহবুব জিজ্ঞেস করলো, তোমার ওয়ার্ক পারমিট আছে?

gronthagar.weebly.com

সেলিম বললো না।

—টুরিস্ট ভিসা?

—জী!

—হায় আল্লা! তুমি যা মাইনে পাবে, ওই জুলফিকার শালা তার আবার অর্ধেক কেটে নেবে। আলম সাহেবকে কত দিয়েছো?

—মানে, উনি তো কিছু নেন নাই।

—বিনি মাগনায় তোমাকে চাকরি জুটিয়ে দিলেন? তুমি লাকি। ওই হারুনের এক ভাই, শুয়োরের বাচ্চা ইফতিকার আমার কাছ থেকে পাঁচশো ডলার নিয়েছিল। আলম সাহেব তাইলে তোমার মুরুব্বি? এই পোড়ার দেশে এলে কেন! নিজের দেশে ভাত জুটলো না?

—তুমি এসেছো কেন!

—আমার দুই বড় ভাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। একজনের লাশ তবু খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, আর একজনের সেটাও গায়েব! ছিল আর তিনটা বোন। বাপ অন্ধ, জমি-জমা সব গেছে। এতগুলান মানুষরে কে খাওয়াবে? ইত্তেফাকে ছবি দেখ নাই, পরমবীরচক্র পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা পেটের দায়ে সাইকেল রিক্সা চালায়। মুক্তিযোদ্ধার বেকার ভাইকে কে কাজ দেবে? বাড়ির মানুষের কষ্ট আর সহ্য করতে

পারলাম না, পালিয়ে এলাম। ওদের যা হয় হোক, আমি তো বাঁচি! এই তো দেখতেছ, বেঁচে আছি কেমন ভাবে! তোমার অবস্থা কি আমর থেকেও খারাপ ছিল?

—প্রায় সমান সমান।

মাহবুব হঠাৎ উঠে বসলো, চোখ দুটি তার জ্বলজ্বল করছে। সেলিমের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো হিংস্রভাবে। তারপর বললো, স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, লড়াই করতে পারিনি। এখন এই শালা আমেরিকানদের দেশে আমি একটা ফ্যালনা। মালিক কথায় কথায় গোত্তা দেয়, খদ্দের ভুরু কুঁচকায়। এক ডলার বখশিস দিলে দাঁত কেলিয়ে থ্যাঙ্ক ইউ বলতে হয়! এইভাবে জীবন কাটাবো ভেবেছো? একটু সামলে নিই, আবার দেশে ফিরে যাবো। আর একটা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে। এরশাদ হলো প্রেসিডেন্ট! যে-সব দালালরা আমার ভাইদের মেরেছে, তারা এখন মন্ত্রী, বড় বড় আমলা! আর একবার আগুন জ্বলবে, বুঝলে, তখন আমি এখানে বসে সাহেবদের বখশিস কুড়োবো না। কিছুতেই না!

রাত্তিরবেলা বাকি চারজনের সঙ্গে পরিচয় হলো সেলিমের।

এর মধ্যে মাহবুবের সঙ্গেই তবু তার মনের খানিকটা মিল খুঁজে পেল। অন্যদের সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। তারা খদ্দেরদের গল্প করে। স্ত্রীলোকদের নিয়ে আদিরসের চূড়ান্ত করে।

gronthagar.weebly.com

বাধ্য হয়ে মাহবুবের বিছানাতেই শুতে হলো সেলিমকে। শিখা যে-টাকা দিয়ে দিয়েছে, তা দিয়ে ম্যাট্রেস, চাদর-বালিশ কিনে নিতে হবে।

পরদিন থেকে সে কাজে লেগে গেল। অনবরত শুধু প্লেট-গেলাস-ডেকচি-কড়াই ধোয়ার কাজ। একটা অ্যাপ্রন জড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কাজ করে যেতে হয়।

বালো মেয়েরা খিলখিল করে হেসেছে। জুলফিকার মেয়েদের পাত্তা দেয় না, সে হোমো।

জুলফিকারের প্রসন্নতায় সামান্য পদোন্নতি হলো সেলিমের। সে এখন রান্নাঘর ছেড়ে রেস্তোরাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এঁটো প্লেট-গ্লাস তোলা ও টেবিল মোছা তার নতুন কাজ। তবু একঘেয়ে ভাবে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকার বদলে এ কাজ একটু ভালো। মানুষ-জন দেখা যায়। কত রকমের মানুষ, কত বিভিন্ন পোশাক, কত রকমের মেজাজ। কেউ বেশি হাসে, কেউ গম্ভীর, কেউ মাতাল হয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েরা টেবিলে বসে অন্যদের অগ্রাহ্য করে একজন একজনের গলা জড়িয়ে ধরে প্রকাশ্যে চুমু খায়। সবই যেন নাটকের দৃশ্য।

লাঞ্চের সময় ও সন্ধের পর 'আগ্রা' রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড় হয়। ভারতীয় খাবার ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। পাঁপড় আর ডাল সবাই খুব পছন্দ করে। নারকোল ও নানা রকম মশলা দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্নাটাও এদেশীদের কাছে অভিনব, চীনারাও এমনভাবে চিংড়ি রাঁধে না।

সেলিম এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যায় একটা ছায়ার মতন, কারুর সঙ্গে তার কথা বলার প্রয়োজন নেই। সে শুধু এঁটো প্লেট-গেলাস তোলে, খালি টেবিল মোছে। কেউই তাকে লক্ষ করে না প্রায়, কিন্তু সে নীরবে সকলের মুখের ভঙ্গি দেখে। সব সে মনে রেখে দেয়। সে এখনো মূকাভিনয় শিল্পী!

gronthagar.weebly.com

॥ ৭ ॥

টিনা একই দিনে দুটো চমক দিল।

রবিবার সকালে সে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরলো দুপুরে খাওয়ার সময়ের একটু আগে। ফিরলো হেমাঙ্গ বোসের সঙ্গে। হেমাঙ্গ এসে দরজার বেল দিল, টিনা বসে রইলো গাড়িতে।

শিখা দরজা খুলতেই হেমাঙ্গ দু' হাত ছড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ! দেখুন, শিখাদেবী, আপনার ছোট বোন আজ গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছেন। পুলিশের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে!

শিখা খুশি মুখে বললো, ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেল বুঝি?

অনীশ এক জায়গায় খুলে যাওয়া ওয়াল পেপারে সেলোটেপ লাগাচ্ছিল একটা টুলে চড়ে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নেমে দরজার

কাছে এসে উকি মেরে জিজ্ঞেস করলো, ওই ভলভো গাড়িটা কার ?

হেমাঙ্গ কয়েকদিন আগেই একটা হুন্ডা কিনেছে, অনীশ তা জানে। এই ভলভো-টা অনেক পুরনো মডেলের, হেমাঙ্গ এ রকম গাড়ি চড়ে না।

হেমাঙ্গ বললো, তুমি তোমার শ্যালিকাকে জিজ্ঞেস করো !

বাড়ির মধ্যে গেঞ্জি-পরা, কিন্তু দরজা থেকে একটু বেরুতে হলেই একগাদা গরম জামা পরতে হয়। অনীশ দ্রুত জুতো-মোজা পরে, গেঞ্জির ওপরেই একটা মোটা ওভারকোট চাপিয়ে নিল।

টিনা তখনও স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে, বাইরে নামেনি। সে বললো অনীশদা, তোমাকে চমকে দেবো ঠিক করেছিলাম। এই গাড়িটা আমি একটু আগে কিনেছি।

হেমাঙ্গ বললো, কত দাম আন্দাজ করতে পারো ? প্র্যাকটিক্যালি ফর্ আ সং !

অনীশের ভুরু কুঁচকে গেল। টিনা গাড়ি কিনেছে ভালো কথা, কিন্তু অনীশকে আগে একবার দেখালো না ! অনীশ এক্সপার্ট, সবাই অনীশকে নিজেদের গাড়ি দেখিয়ে মতামত নেয়। হেমাঙ্গটা গাড়ির কী বোঝে ?

শিখা দরজার বাইরে আসছে না। দু'দিন ধরে দারুণ ঠান্ডা পড়েছে। শিখা একটু আগে স্নান করেছে, চুল এখনো ভিজে, এই ভিজে চুলে বাইরের হাওয়া লাগালেই মাথা ধরে যায়। সে চেঁচিয়ে বলছে, ওমা, শিখা, তুই এর মধ্যেই গাড়ি কিনলি কেন ?

গাড়িটা চালিয়ে দেখারও ইচ্ছে হলো না অনীশের। সে চলে এলো ভেতরে।

হেমাঙ্গ ভেতরের পাপোশে পা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলো, কী রান্না হয়েছে আজ ? ইলিশের গন্ধ পাচ্ছি ?

শিখা বললো, বসুন, খেয়ে যাবেন। গাড়িটা কত দিয়ে কিনলি রে, টিনা ?

টিনা বললো, সাতশো ডলার। বিশ্বাস করতে পারবে ? অবশ্য গাড়ি না বলে এটাকে একটা জ্যালোপি বলাই উচিত।

অনীশ ঠেস দিয়ে বললো, উ ! আমেরিকায় এসেছে এখনো পাঁচ মাসও হয়নি, এর মধ্যে মেয়ে জ্যালোপি শিখে গেছে !

টিনা বললো, এসব জানার জন্য আমেরিকায় আসতে হয় না। বই পড়লেই শেখা যায়।

শিখা বললো, ওমা, সাত শো ডলার কম কী ? শুধু শুধু একটা

গাড়ি কিনতে গেলি কেন ? লাইসেন্স পেয়েছিস, আমাদের যে-কোনো একটা চালাতেই তো পারতিস !

হেমাঙ্গ বললো, যাই বলো, নিজের গাড়ি না থাকলে ঠিক স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। টিনা বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হই-হুল্লোড় করতে যাবে।

টিনা বুদ্ধিমতী ও চাপা মেয়ে। দ্বিতীয় চমকটা সে হেমাঙ্গর সামনেও ভাঙলো না। গাড়িটা কেনার জন্য হেমাঙ্গর সাহায্য নিতে হয়েছে, সে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, অনেক পুরনো গাড়ির খবর রাখে। তা ছাড়া টিনা জানতো, সে গাড়ি কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শিখা-অনীশ দু'জনেই বাধা দিত।

বিকেলবেলা চায়ের টেবিলে, হেমাঙ্গ ততক্ষণে চলে গেছে, টিনা বললো, সেজদি, আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি। নেক্সট মঙ্গলবার থেকে সেখানে চলে যাবো।

শিখার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কোনো কারণে কি তার ছোট বোনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, সে অপমানিত বোধ করেছে ? না হলে সে চলে যেতে চাইবে কেন ?

অনীশ চুপ করে চেয়ে আছে, কোনো মন্তব্য করলো না।

টিনা বললো, এখান থেকে আমার ইউনিভার্সিটি বড্ড দূর হয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া রীনা আসছে ছুটিতে, ওর ঘরটা আমি দখল করে আছি।

শিখা বললো, রীনা এলে তোর জায়গা হবে না ? সেলিমও তো এতদিন ছিল। অত বড় বেসমেন্ট খালি পড়ে আছে। তাছাড়া, তোর এখন নিজের গাড়ি, ইউনিভার্সিটি যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই।

টিনা বললো, যেতে আসতে দু'ঘন্টা লেগে যায়।

শিখা বললো, তা বলে এক গাদা পয়সা খরচ করে তুই অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিবি ? একই শহরে, আমাদের বাড়ি থাকতেও...লোকে ভাববে—

অনীশ এবারে চাপা বিদ্রূপের সুরে বললো, তোমার বোন গাড়ি কিনে স্বাধীন হয়েছে, এবার তো তার নিজস্ব বাড়ি লাগবেই।

টিনা জোর দিয়ে বললো, কেন, স্বাধীন হওয়াটা বুঝি খারাপ ? আমি এ মাস থেকে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাচ্ছি চোদ্দোশো ডলার, আমি এখন নিজের অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারি।

শিখা শুধু ভেবে চলেছে, বাসবী কী বলবে। টিনা আরও দুটো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিল। এখানে এসেছে নিজের দিদির

কাছে থাকবে বলেই তো। তবু সে আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাচ্ছে, অনর্থক টাকা খরচ করছে, তার মানে নিশ্চয়ই দিদি কিংবা জামাইবাবুর সঙ্গে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এই কথাটিই তো অন্যদের কাছে ছড়াবে।

শিখার বিমর্ষ মুখ দেখে টিনা উঠে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বললো, সেজদি, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। আমি হস্টেলে থাকতাম, একা থাকা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। চলো, আমার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখবে চলো, তুমি ওটা সাজিয়ে দেবে!

টিনার অ্যাপার্টমেন্টটা তার একার নয়, সঙ্গীতা নামে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি। নর্থ ডিবিউকে একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির দোতলাটা ওদের। দুটি বেড রুম, কিচেন-বাথরুম কমন। কিচেনের সঙ্গে খানিকটা ডাইনিং স্পেস আছে। সেটাই বসবার জায়গা। এক এক জনকে দিতে হবে দেড়শো ডলার।

সামনেই ছোট নদী, নদীর ধারে ধারে পার্ক। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস এখান থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে। জায়গাটা সত্যি সুন্দর এবং টিনার পক্ষে যে খুব সুবিধেজনক তা অস্বীকার করা যায় না। শিখা রান্নাঘরের জিনিসপত্র, বিছানার নতুন চাদর-বালিশ-কম্বল সব এনে দিল, ওগুলো টিনাকে কিনতে হবে না। বাথরুমটার অবস্থা ভালো ছিল না, নিজেই পরিষ্কার করে দিল শিখা, এ দেশে তো আর মেথর পাওয়া যাবে না।

groupbangla.weebly.com

সাজানো-গোছানোর পর টিনার বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে শিখা বললো, আঃ, আমারই ইচ্ছে করছে এখানে থেকে যেতে। সংসার সামলানোর কত ঝামেলা! নিজের বাড়ি থাকলেও, এটা সারাও, প্লাম্বারকে ডাকো, হিটিং চালাও, বন্ধ করো...তোর এখানে সব বাড়িওয়ালা করে দেবে! একই রুটিন বাঁধা চাকরি, আর ভালো লাগে না!

টিনা বললো, সেজদি, তুমি মাঝে মাঝে আমার এখানে এসে থাকলে পারো। অনীশদা মিকিকে দেখবে, রান্না করে খাওয়াবে।

শিখা বললো, আর বাসবী অমনি সবাইকে বলে বেড়াবে, অনীশের সঙ্গে আমার ডিভোর্স হতে আর বাকি নেই!

অনীশ প্রথম বেশ কয়েকদিন টিনার অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে আসেনি।

অফিসের কাজে তাকে ভ্যাঙ্কুভার যেতে হলো এক সপ্তাহের জন্য। প্রত্যেকদিনই সে সেখানকার হোটেল থেকে ফোনে শিখার

সঙ্গে কথা বলে, টিনার কথা একবার জিজ্ঞেসও করে না। তাতেই শিখার সন্দেহ হয়। তা হলে কি সত্যিই টিনার সঙ্গে অনীশের কখনো ঝগড়া হয়েছে? কিসের জন্য ঝগড়া হবে? সে রকম কিছু হলেও শিখা জানবে না?

টিনাও এ বাড়িতে যখন তখন ফোন করে। মিকির সঙ্গে গল্প করে, শিখার সঙ্গে তো কথার শেষ নেই। অনীশ প্রথম ফোন ধরলে নিজে কিছু জিজ্ঞেস না করে বলে, ধরো, তোমার সেজদিকে ডেকে দিচ্ছি।

শিখা একদিন বললো, তুমি একবারও টিনার খোঁজ খবর নিলে না? ওর অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতেও গেলে না?

অনীশ গম্ভীরভাবে বললো, তুমিই তো দেখে এসেছো। আমার আর দেখবার কী আছে? সব অ্যাপার্টমেন্টই এক রকম হয়!

একটু হালকা গলায় শিখা বললো, ওর সঙ্গে একটি গুজরাতি মেয়ে থাকে, সে কিন্তু দারুণ সুন্দরী।

অনীশ বললো, সুন্দরী মেয়ের কথা শুনলেই আমি ছুটে যাই, এই বুঝি তোমার ধারণা?

granthagar.weebly.com

—আমি কি তাই বলেছি? ও রকম ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলছো কেন? সুন্দর একটি মেয়ে দেখলে সব পুরুষরাই খুশি হয়!

—টিনার বয়ফ্রেন্ডরা ওখানে যায়। আমি গেলে অসুবিধে হবে।

—বয়ফ্রেন্ডরা মানে কী? তুমি এখনো ইংরিজি শেখোনি। কোনো ডিসেন্ট মেয়ের এক জনের বেশি বয়ফ্রেন্ড থাকে না।

—তোমার কাছে এখন ইংরিজি শিখতে হবে?

—আই অ্যাম সরি, ওভাবে বলা আমার উচিত হয়নি।

—ইউ অট টু বি সরি!

—বললাম তো। এক্সট্রিমলি সরি। শোনো, টিনার সঙ্গে কখনো তোমার ঝগড়া হয়েছে?

—কেন, ঝগড়া হবে কেন? ওর সঙ্গে কি আমার ঝগড়ার সম্পর্ক?

—তবে তুমি কেমন যেন অ্যালুফ হয়ে আছো ওর ব্যাপারে।

—আমাকে না জিজ্ঞেস করে, আমাকে না দেখিয়ে ও যদি গাড়ি কিনতে পারে, তাহলে ওর ব্যাপারে আমি আর ইনটারেস্ট দেখাতে যাবো কেন?

শিখা এবার হো-হো করে হেসে উঠলো।

ও, এই ব্যাপার? গাড়ি নিয়ে অভিমান! এই জন্যই অনীশ

আজকাল হেমাঙ্গর সঙ্গেও ভালো করে কথা বলে না ! একটা পত্রিকায় শিখা সম্প্রতি পড়েছে, এ দেশে গাড়ি-বাতিক একটা অসুখের পর্যায়ে এসে গেছে। মজা করে তার নাম দেওয়া হয়েছে অটো-এরটিসিজম্। অনেক অ্যামেরিকানের সারাদিনের কথা ও চিন্তার অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে গাড়ি।

অনীশকে কথা দিতে হলো, সে একদিন টিনার খোঁজ নিতে যাবে। না হলে ব্যাপারটা ভালো দেখায় না।

সপ্তাহের মাঝখানে, অফিস থেকে কোনো কাজে বেরিয়ে, অনীশ ঠিকানা খুঁজে এলো টিনার অ্যাপার্টমেন্টে। এ সময় টিনা বাড়িতে না থাকতেও পারতো, অনীশ আগে ফোনও করেনি। হয়তো তার অবচেতনে ছিল, বুধবার টিনার কোনো ক্লাস থাকে না।

ম্যাজিক আই দিয়ে না দেখে টিনা দরজা খোলে না। শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরা, এই অবস্থায় অন্য পুরুষকে দেখে দরজা খোলার প্রশ্নই ওঠে না। টিনা একটা হাউজ কোট জড়িয়ে নিল।

সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। রাস্তা, গাছপালা একেবারে সাদা। মাঝে মাঝে উঠছে ঝোড়ো-হাওয়া। শিকাগোর কুখ্যাত ঘূর্ণিঝড় মাঝে মাঝে এদিকেও ধেয়ে আসে। আজ ঘরে বসে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে থাকার দিন। তবু এমন দিনেও সকলকে কাজে বেরুতে হয়।

অনীশ দরজার বাইরে পা ধুপধাপ করে জুতো থেকে বরফ ঝাড়লো। দু' হাতের দস্তানা খুলে রাখলো ওভার কোটের পকেটে। মাথায় টুপি পরেনি, তুষারের গুঁড়োয় চুল সাদা হয়ে গেছে। গাড়ি পার্ক করে শুধু দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসেছে, তাতেই এই অবস্থা।

সে দুদিকে হাত ছড়াতেই টিনা তার ওভারকোটটা খুলে দিল।

অনীশদের বাড়ির তুলনায় এই অ্যাপার্টমেন্টের ঘরের সিলিং নিচুতে, তাই অনীশকে এখানে আরও লম্বা দেখায়। সে টিনার দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না।

টিনা বললো, অনীশদা, আমি রান্না করছিলাম। ভাত চাপানো আছে, একটু দেখে আসছি।

অনীশ খাবারের টেবিলের পাশ দিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরলো কাচে। বৃষ্টির মতন তুষারপাত হচ্ছে, একটু দূরের নদীটাকে মনে হচ্ছে দুধের নদী। গাছগুলোতেও থোকা থোকা সাদা ফুলের মতন বরফ। তুষারপাতের

সময় কোনো শব্দ শোনা যায় না। কাজ-পাগল অনীশেরও আজ মনে হলো, আজ কাজ ভোলার দিন।

রান্না ঘরের ফ্রিজ খুলতে খুলতে টিনা জিজ্ঞেস করলো, অনীশদা, আমি বীয়ার খাচ্ছিলাম, আপনি একটা নেবেন ?

অনীশ বললো, নিতে পারি।

ফটাস করে ক্যান খোলার শব্দ হলো। ফেনা উপচে-ওঠা বীয়ার ক্যানটা হাতে নিয়ে টিনা দাঁড়ালো অনীশের পাশে। অনীশ তার কাঁধে একটা হাত রাখলো, দু'জনেই দেখতে লাগলো বাইরের দৃশ্য।

কয়েক মিনিট পরে টিনা জিজ্ঞেস করলো, অনীশদা, আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে দেখবে না ?

টিনার কাঁধে হাত রেখেই অনীশ ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখলো রান্নাঘর, বাথরুম, শোবার ঘরে। টিনার খাটের মাথার কাছের দেয়ালে ক্লদ মোনে'র একটা ছবির প্রিন্ট, সেটা একটু বেঁকে আছে, অনীশ ঠিক করে দিল।

দু'জনে কথা বলছে খুবই কম।

অনীশ অনুভব করলো, এই কয়েকটা দিনেই টিনার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এটা তার নিজের ভাড়া নেওয়া বাড়ি, নিজস্ব ঘর, এখানে এসেই সে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক পরিণত। দিদির বাড়িতে সে যেন ছিল একটা বাচ্চা মেয়ে, আদরের ছোট বোন। এখন তাকে মনে হচ্ছে পরিপূর্ণ নারী।

যতদিন ও বাড়িতে ছিল, তখনও মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, কোনো সময়ে বাড়িতে মিকি কিংবা শিখা নেই, টিনা আছে, অনীশ অফিস থেকে ফিরছে। কিন্তু শুধু দু'জন নারী ও পুরুষ যে রয়েছে বাড়িতে নিরালায়, এমন অনুভূতি কখনো হয়নি অনীশের, টিনার দিকে কখনো সে বিশেষ চোখে তাকায়নি, সব কিছুই ছিল স্বাভাবিক। এখানে, এই নির্জন ঘরে কি টিনাই বদলে গেছে, না অনীশও বদলেছে ? অনীশ নিজেই ঠিক স্বাভাবিক, সাবলীল তো হতে পারছে না !

টিনা জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো দুপুরে ভাত খান না, একটা সার্ডিন-স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেবো ?

অনীশ বললো, উঁহু, কিছু খাবো না।

—আর একটা বীয়ার ?

—এটা এখনো শেষ হয়নি। তোমার একজন রুমমেট থাকে শুনেছি, সে কোথায় ?

—রুমমেট নয়। অ্যাপার্টমেন্ট-মেট বলা যেতে পারে। তার আজ ক্লাস আছে।

—তৃণা!

—কী?

অনীশ আর কিছু বললো না, শুধু তাকিয়ে রইলো টিনার দিকে।

ভাত উথলে গেছে, টিনা দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট সসপ্যানটায় ঢাকনা দিল। তারপর নামিয়ে উল্টে দিল ফ্যান গালার জন্য। শিখার কাছে থাকার সময় টিনা একদিনও ভাত রান্না করেনি, ফ্যান গালতে পারবে না এই ভয়ে। এখানে সে নিজে নিজেই শিখে নিল?

একটু পরে অনীশ আবার ডাকলো, টিনা, এদিকে এসো—

টিনা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অনীশ বলো, রাস্তার ওই লোকটাকে দেখো!

একজন লোক, মধ্য বয়স্ক, গায়ে একটা ছেঁড়াখোঁড়া ওভারকোট, গলায় মাফলার জড়ানো, ঠিক বাচ্চা ছেলের মতন খেলা করছে রাস্তায়। সাইড ওয়াক-এর ধারে জমে থাকা বরফে লাথি মারছে, বরফের মণ্ড পাকিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফছে, গাছের ঝুলেপড়া ডাল ধরছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কেউ দেখছে কিনা কোনো খেয়াল নেই।

টিনা স্মিত হেসে বললো, ওকে চিনি, মিঃ ম্যাকফারসন, পাগলাটে ধরনের মানুষ, ফিজিকস লেবরেটারিতে কাজ করে, একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলে।

অনীশ বললো, মাঝে মাঝে আমারও ওরকম পাগল হতে ইচ্ছে করে।

টিনা বেশ অবাক হয়ে অনীশের দিকে তাকালো।

হঠাৎ অনীশ টিনাকে সামনে নিয়ে এসে, তার দু কাঁধে হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললো, টিনা, তোমাকে আদর করবো? খুব ইচ্ছে করছে।

টিনা বললো, আমি যখন ছোট ছিলাম, আপনি আমায় কত আদর করতেন!

অনীশ টিনাকে চেপে ধরলো নিজের বুকে। তার রেশমের মতন চুলে ঠোঁট ছোঁয়ালো। টিনা একটা পোষা বেড়ালের মতন উপভোগ করলো সেই আদর।

এরপর অনীশ দুহাতে টিনার মুখখানি তুলে ধরে আলতো চুম্বন দিল একবার। টিনার হাউজকোটে বোতাম আটকানো নেই। সেটা একটু ফাঁক করে দেখলো টিনার বুক।

টিনা এবার অনীশের হাতের ওপর নিজের হাত রেখে খুব নরম

গলায় বললো, শ্যালিকা হয়ে জামাইবাবুর আদর না পেলে খুব দুঃখ হয়। অনেকদিন আপনি আমাকে আদর করেননি।

অনীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে টিনা আবার বললো, তবে জানেন তো, জামাইবাবুর আদরের একটা সীমারেখা থাকে। এই যে আপনার হাতটা যেখানে, সেটাই সীমারেখা।

অনীশ বললো, তাই? এই পর্যন্ত?

টিনা বললো, হ্যাঁ মশাই!

অনীশ একটু দূরে সরে গেল।

টিনা ফুরফুরিয়ে হেসে বললো, আপনি হচ্ছেন খাঁটি পুরুষের মতন পুরুষ, এবং খাঁটি জেন্টেলম্যান। এই জন্য আপনাকে এত অ্যাডমায়ার করি।

যেন একটা সম্মোহনের ঘোর ছিল, হঠাৎ সেটা কেটে গেল। তার মুখের চামড়া টান টান হয়ে গিয়েছিল, কানের নীচে ছিল আগুনের আঁচ। দুহাতে ভালো করে মুখটা ঘষলো অনীশ। তারপর খাওয়ার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে বললো, তুমি চমৎকার মেয়ে। আর একটা বীয়ার দাও।

টিনা বললো, আমার ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার খেয়ে নিই। আপনি এখনো ভেবে দেখুন, একটা স্যান্ডুইচ খাবেন কি না।

অনীশ বললো, ঠিক আছে, দাও।

এরপরে আরও প্রায় এক ঘণ্টা বসে গল্প করলো অনীশ। টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি। আর একবারও টিনাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করলো না, ওর হাউজকোটের আড়ালে তার শরীর দেখতে চাইলো না। আর নারী ও পুরুষ নয়, দুজন মানুষ।

বিদায় নেবার সময় টিনা আবার পরিয়ে দিল তার ওভারকোট। টিনা নিজেই অনীশের বুকের কাছে এসে, ফরাসি কায়দায় তার দু গালে তিনটি চুমু দিয়ে বললো, মাঝে মাঝে আসতে হবে কিন্তু। না হলে আমি খুব রেগে যাবো। কোনোদিন আপনাদের বাড়িতে যাবো না!

হেমাঙ্গর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্য রকম।

হেমাঙ্গকে এখানকার ঠিকানা দেয়নি টিনা। তবু হেমাঙ্গ ঠিক জেনেছে এবং এক দুপুরে এসে উপস্থিত।

ম্যাজিক আই-তে দেখে টিনা দরজা না খুলে ফিরে এলো। তার সঙ্গিনী মেয়েটি সেদিন বাড়িতে রয়েছে। তাকে টিনা বললো, একটি লোক এসেছে, তাকে আমি মিট করতে চাই না। তুমি প্লিজ ওকে

বলে দাও, আমি নেই, কলেজে গেছি।

সঙ্গীতা পুরো দরজা না খুলে, চেইন গার্ড আটকে, সামান্য ফাঁক করে বললো, টিনা বাড়িতে নেই।

হেমাঙ্গ বললো, আমি তার বিশেষ বন্ধু। ভেতরে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে পারি?

সঙ্গীতা বললো, তাতে আমার অসুবিধে হবে। আমাদের মধ্যে কারুর অনুপস্থিতিতে আমরা অতিথিদের ভেতরে আসতে বলি না। আপনার কোনো মেসেজ কিংবা কার্ড থাকলে দিয়ে যেতে পারেন।

এতে দমে যাবার পাত্র নয় হেমাঙ্গ। সে আবার এলো, এবং এমন সময়, যখন সঙ্গীতা নেই।

তিন-চারবার বেলের আওয়াজ শোনার পর টিনা মনঃস্থির করে দরজা খুললো। চেইন গার্ড দিয়ে আটকালো না, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইলো দরজা জুড়ে।

হেমাঙ্গর হাতে ফুলের তোড়া। এক গুচ্ছ লাল গোলাপ। এক গাল হেসে হেমাঙ্গ বললো, তুমি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছো, আমাকে আগে জানাওনি? বেশ করেছো, খুব ভালো করেছো, দিদির আঁচলের তলায় কতদিন থাকবে! এ দেশের মেয়েরা বাবা-মায়ের কাছেই থাকে না।

গোলাপগুলো নিয়ে গন্ধ শুঁকলো টিনা। মুগ্ধ আবেশে বললো, লাভলি, হাউ লাভলি! থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্কস আ লট, হেমাঙ্গদা।

এই প্রবল শীতের মধ্যে গোলাপ। লিবিয়া থেকে আমদানি করা, গলা-কাটা দাম। সেই গোলাপ টিনার হাতে ধন্য হলো।

হেমাঙ্গ এক পা বাড়িয়ে বললো, চলো, তোমার অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে দেখি।

একটুও না সরে, মিষ্টি হেসে টিনা বললো, উঁহুঁ, তা তো হবে না।

বিস্ময়ে অনেকখানি ভুরু তুলে হেমাঙ্গ বললো, তুমি আমাকে ভেতরে যেতে বলবে না?

সেই রকম হাসিমুখেই দুদিকে মাথা দোলালো টিনা।

এবারে অন্য একটা সন্দেহে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো হেমাঙ্গ।

টিনা বললো, না, আপনি যা ভাবছেন তাও নয়। ভেতরে কেউ নেই। শুনুন হেমাঙ্গদা, আমি আর আমার বান্ধবী নিয়ম করেছি, দুজন এক সঙ্গে না থাকলে আমরা কোনো অতিথিকে ভেতরে এনে এন্টারটেইন করবো না।

granthagar.weebly.com

হেমাঙ্গ বললো, বুল শীট ! দিস ইজ আমেরিকা। ইট্‌স আ ফ্রি কান্ট্রি ! আমি কি ভেতরে ঢুকলে তোমাকে খেয়ে ফেলবো নাকি ?

টিনা বললো, এই অ্যাপার্টমেন্টটা সঙ্গীতার নামে। আমি ওর সঙ্গে শেয়ার করি। ওর নিয়ম তো আমাকে মানতেই হবে ! আপনি রোববার সকালে আসুন না, সঙ্গীতার সঙ্গেও আলাপ হবে।

এরকম ভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তর্কবিতর্ক করা যায় না। হঠাৎ রাগে হেমাঙ্গর মুখখানা গনগনে হয়ে গেল। মাঝপথে কথা থামিয়ে সে দুমদাম করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলতে লাগলো, বীচ ! বীচ !

টিনাকে গাড়ি চালানো শেখানো, ড্রাইভিং লাইসেন্স বার করে দেওয়া, গাড়ি কিনিয়ে দেওয়া, আরও কত টুকিটাকি উপকার করেছে হেমাঙ্গ। বত্রিশ ডলার দিয়ে গোলাপগুচ্ছ কিনে এনেছে, তাও দিব্যি হাত পেতে নিল। অথচ এককাপ চাও খেতে বললো না আজ। এত অকৃতজ্ঞ ! এত স্বার্থপর ! সমস্ত মেয়েছেলে জাতটাই এরকম !

হেমাঙ্গ একলা থাকে, তার বাড়িতেও কোনোদিন যায়নি টিনা। নিজে থেকে সে কোনোদিন হেমাঙ্গকে ফোন করেনি। হেমাঙ্গ যেচে, গায়ে পড়ে তার কোনো উপকার করতে চাইলে সে নেবে না কেন ? তার বিনিময়ে কিছু দিতে হবে, এরকম শর্ত আছে নাকি ? কেউ ফুল নিয়ে এলে ফিরিয়ে দেওয়া চরম অভদ্রতা !

granthagar.weebly.com

এই সব ভাবতে ভাবতে টিনা ফুলগুলো সাজাতে লাগলো ফুলদানিতে।

টিনা এবং সঙ্গীতা দু'জনেরই দুটি পুরুষ বন্ধু আছে। সঙ্গীতার বন্ধুর নাম ডেভিড পারেখ, সে একজন আফ্রিকান গুজরাতি। এখানে ওর একটা লেপ-তোশকের দোকান আছে। সারা আমেরিকা জুড়ে ওদের পারিবারিক ব্যবসা, প্রচুর টাকা। ডেভিড পারেখ বিবাহিত, তার স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ে থাকে বাল্টিমোর শহরে। আপাতত সেপারেশান। ডিভোর্স হয়ে গেলে সে সঙ্গীতাকে বিয়ে করবে। তার আগে অবশ্য ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতায় কোনো বাধা নেই।

টিনার ধারণা ছিল, গুজরাতিরা বুঝি খুব রক্ষণশীল হয়। সঙ্গীতা মোটেই সেরকম নয়। তার পোশাক যথেষ্ট উগ্র, সে যে সুন্দরী সেটা সে সব সময় মনে রাখে এবং সবাইকে বোঝাতে চায়। টিনার চেয়ে সঙ্গীতা সত্যিই অনেক বেশি সুন্দরী, সে নাচতে জানে, পশ্চিমী নাচ চমৎকার পারে, ডেভিডের সঙ্গে নাচতে যায় প্রায়ই। আর ডেভিড পারেখ, নামে গুজরাতি হলেও, আসলে কালো সাহেব।

ডেভিড মাঝে মাঝেই সন্ধের পর আসে প্রচুর খাবার দাবার নিয়ে। তিনজনে গল্প হয় অনেক রাত পর্যন্ত, টিনা আর সঙ্গীতা একটু-আধটু বীয়ার কিংবা রেড ওয়াইন খায় ডেভিড স্কচ টানতে পারে অনেকটা। এক এক রাতে সে থেকে যা। টিনাকে গুড নাইট জানিয়ে সঙ্গীতার কোমর জড়িয়ে ওর ঘরে শুতে চলে যায়। চক্ষুলজ্জার কোনো ব্যাপারই নেই।

টিনার বন্ধু একজন চীনে। সে বিদেশী ছাত্র নয়, আমেরিকান চীনে, এ দেশেই জন্ম, চীনে ভাষা প্রায় জানেই না। লী কুয়ান স্বভাব-লাজুক, এর আগে নাকি তার কোনো মেয়ে-বন্ধুই ছিল না, মেয়েদের সঙ্গে সে কথা বলতেই পারে না। টিনার সঙ্গেও সে নিজে আলাপ করেনি, ব্যাপারটা আপনা আপনি ঘটে গেছে।

দিদির বাড়িতে থাকার সময় ইউনিভার্সিটি যাওয়া-আসার খুব অসুবিধে হচ্ছিল টিনার। কে তাকে রোজ রেল টিউব স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে ! সেই জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনটার দরজায় একটা নোটিস সেঁটে দিয়েছিল। সে কারুর গাড়িতে নিয়মিত রাইড চায়, গ্যাসের দাম শেয়ার করতে রাজি আছে। সেই আবেদনের উত্তর দিয়েছিল লী কুয়ান। তখনও সে জানতো না টিনা রয় কোন দেশের মানুষের নাম, ছেলে না মেয়ে।

granthagar.weebly.com

প্রথম কয়েকদিন সে টিনাকে বাড়ি থেকেতুলে নিয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে, নিজে থেকে বিশেষ কিছু কথাবার্তাইবলেনি। টিনার অত জড়তা নেই, সে পুরুষদের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে পারে। লী গাড়ি চালাবার সময় সারাক্ষণ বাজনা শোনে, সবই ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল। টিনাও এই ধরনের সঙ্গীত ভালোবাসে, সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু হয়। লী নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ছাত্র, পি এইচ ডি করছে, পড়াশুনোর দিকেই খুব ঝোঁক, আর তার শখ গান-বাজনা। টিনা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কিছু বোঝে না, গান-বাজনার সূত্রে দু'জনের অন্তরঙ্গতা হয়। লী'র স্বভাবে কোনোরকম ছ্যবলামি নেই, লোভের পরিচয় নেই, সব সময় সীরিয়াস, এই রকমএকটি ছেলেকেই যে টিনার এত ভালো লেগে যাবে, তা সে নিজেই আগে জানতো না।

এখন টিনার নিজের গাড়ি আছে, লী'র সঙ্গে যাবার প্রয়োজন হয় না, তবু ওদের প্রায়ই দেখা হয়। এই অ্যাপার্টমেন্টেও লী আসে। কিন্তু এখানে তার রাত কাটাবার কোনো প্রশ্নই নেই, টিনা এখনো লী'র সঙ্গে একবারও এক শয্যায় শোয়নি। চুম্বনের বেশি এগোয়নি তাদের অন্তরঙ্গতা। লী'র সঙ্গে যদি বরাবর এরকম বন্ধুত্বের সম্পর্কই থেকে

যায়, তাতেও আপত্তি নেই টিনার। লী এ পর্যন্ত একবারও তাকে ভালোবাসার কথা বলেনি, ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি, ভালোবাসার সম্পর্ক না হলে টিনা কারুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যেতে রাজি নয়। বাইরে যতই সপ্রতিভ হোক, ভেতরে ভেতরে টিনা আসলে বেশ রোমান্টিক, তার ধারণা, ভালোবাসা একটা দৈব ব্যাপারের মতন, যখন তখন আসে না, একবার ভালোবাসা এলে সব গ্লানি, সব তুচ্ছতা মুছে যায়।

ডেভিড পারেখ এক সন্ধেবেলা এসেই তাড়া দিয়ে বললো, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও। চলো, আজ বাইরে কোথাও খেতে যাই, আজ বাড়িতে বসে থাকার দিন নয়।

কথাটা ঠিক। কাল থেকে তুষারপাত বন্ধ আছে, আজ চমৎকার রোদ উঠেছিল। এই রকম শীতের সময় বিকেল হতে না হতেই অন্ধকার নেমে আসে, আকাশ কালিবর্ণ, দেখাই যায় না। কিন্তু আজ আকাশ পরিষ্কার, সন্ধের পরই ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। জমাট বরফ হয়ে থাকা নদীটা এই জ্যোৎস্নায় যেন দুলতে থাকে। পৃথিবীকে মনে হয় নীল। এই সময় শহর ছাড়িয়ে মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে গেলে দেখা যায় রাস্তার দু পাশে জমে থাকা বরফের ওপর প্রতিফলিত জ্যোৎস্না, আর কিছু নেই। তুষার-যুগে ফিরে যাওয়ার অনুভূতি হয়।

gronthagar.weebly.com

সঙ্গীতা বললো, চলো টিনা, লীকেও ফোন করে দাও, ওকে আমরা তুলে নেবো।

লীকে ফোন করা হলো, কিন্তু সে যেতে পারছে না। সানফ্রান্সিসকো থেকে তার ছোট ভাই এসে পৌঁছোবে একটু পরেই। তাকে রিসিভ না করে সে বেরুবে কী করে?

ডেভিড বললো, টিনা, তোমার একলা একলা খারাপ লাগবে না তো? তোমার জন্য আর একজন সঙ্গী জোগাড় করবো?

টিনা চটুল ভাবে বললো, কেন, তোমার ডাইনে-বাঁয়ে দু'জন সঙ্গিনী রাখতে আপত্তি আছে?

ডেভিড হা-হা করে হেসে উঠে বললো, না, না, আপত্তি থাকবে কেন? দা মোর দা মেরিয়ার!

ডেভিড পারেখের বি এম ডব্লু গাড়ি। সামনের সিটে সঙ্গীতা বসবে, কিন্তু টিনা পেছনে একা থাকলে খারাপ দেখায়, তাই টিনাকে জোর করে চেপেচুপে বসানো হলো সামনে। তারপর সে স্টার্ট দিতে দিতে বললো, আজ খবরে বলেছে, লেক মিশিগানের জলে বড় বড় বরফের চাঁই ভাসছে, চলো আগে সেটা দেখে আসি।

বেশি শীতের সন্ধ্যায় সচরাচর লোকে একবার বাড়ি ফেরার পর আর বেরুতে চায় না, কিন্তু এখন পথে অনেক গাড়ি। এই জ্যোৎস্নাটা অনেকে উপভোগ করতে চায়। সত্যি আকাশ আজ বিস্ময়কর ভাবে পরিষ্কার। এত নক্ষত্র, এত বড় একটা চাঁদ দেখা যায়নি বহুদিন। লেক মিশিগানের ধারে পিলপিল করছে মানুষ। অনেকে জলের কিনারা ঘেঁষে বরফ দেখতে যাচ্ছে। বাতাস সাজ্ঘাতিক ঠাণ্ডা। তুষারপাত যখন থেমে যায়, তখনই ঠাণ্ডা বেশি লাগে। আজ শূন্যের নীচে বারো ডিগ্রি।

সঙ্গীতা গাড়ি থেকে একবার নেমেই বললো, উঃ, না, না, বাইরে ঘুরতে পারবো না!

টিনাও একবার নামলো। দুহাতে গ্লাভ্‌স, মাথায় টুপি, শরীরে কয়েক প্রস্থ পোশাক, কিন্তু নাকটা তো কোনোক্রমেই ঢাকা যায় না। নাকের ডগা যেন ঠাণ্ডা বাতাসের ছুরিতে কেটে যাচ্ছে। গ্লাভ্‌সের মধ্যেও আঙুলগুলো কনকন করে।

তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে উঠে গরমে আরাম পাওয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরে ডেভিডের গাড়ি থামলো একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁর সামনে। 'আগ্রা'। টিনা কিংবা সঙ্গীতা এখানে আগে আসেনি। সঙ্গীতা নিরামিষাশী, কিন্তু ডেভিড পারেখ মাংস খাওয়ার যম! তার আজ ঝাল ঝাল মুরগ্‌-মসল্লম খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

grontthagar.weebly.com

রেস্তোরাঁর সামনে অনেক গাড়ি। একটু দূরে ডেভিডের গাড়ি পার্ক করে হেঁটে আসতে গিয়ে বরফের মধ্যে পা ডোবাতেই হলো। টিনা আজ ভুল করে স্নো-বুট পরে আসেনি, তার জুতো ভিজে রইলো।

রেস্তোরাঁটিতে দুটো লেভেল। সামনের দিকে কিছু টেব্‌ল পাতা, তারপর পেছন দিকে কয়েকটা সিঁড়ি, ওপরে একটু উঁচুতে আরও বসবার জায়গা। কোনোক্রমে একটা টেব্‌ল পাওয়া গেল সেখানে। ডেভিড তেষ্টায় ছটফট করছে, প্রথমেই সে তার স্কচের অর্ডার দিয়ে টিনাকে বললো, তুমি আজ একটু ব্র্যান্ডি খাও। তোমার জুতো ভিজে গেছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

টিনার আপত্তি নেই, সত্যি তার পা দুটো যেন হিম হয়ে গেছে। যেন সে আর হাঁটতেই পারবে না। একেই কি 'কোল্‌ড ফিট' বলে?

পরপর দুটো ব্র্যান্ডি খেয়ে সে অনেকটা চাঙ্গা হলো। সঙ্গীতা রেড ওয়াইন ছাড়া আর কিছু খায় না। ডেভিড অন্তত চারটে হুইস্কি না

গেয়ে খাবার অর্ডার দেবে না। তাই চলতে লাগলো গল্প।

এই উঁচু জায়গাটা থেকে পুরো রেস্তোরাঁটাই দেখা যায়। এক সময় টিনার মনে হলো, দূরে একজন ওয়েটার মন দিয়ে একটা খালি টেব্‌ল পরিষ্কার করছে, সে যেন চেনা চেনা। সেলিম? হ্যাঁ, তাই তো। সেলিমের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সেলিম তো একটা রেস্তোরাঁতেই চাকরি পাওয়ার কথা বলেছিল বটে।

টিনা চেষ্টা করলো সেলিমের চোখে চোখ ফেলতে। তাহলে ডেকে কথা বলবে। কিন্তু সেলিম একবারও এদিকে তাকাচ্ছে না, এদিককার টেব্‌লে আসছেও না। আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমেরিকানরা বেশি রাত করে ডিনার খায় না, তারা শেষ করে ফেলেছে, কয়েকজন ভারতীয়ই শুধু বসে আছে এখনো। সেলিম কি দেখতে পাচ্ছে না টিনাকে, কিংবা চিনতে পারেনি?

চিনবে না কেন, টিনা যখন ঢুকেছে, তখনই তো তাকে দেখতে পেয়েছে সেলিম। দেখামাত্র বুক কেঁপে উঠেছে একবার, মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

যতই ডিগনিটি অফ লেবারের কথা বলা হোক, এই অবস্থায় টিনার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না সেলিম। ওয়েটারের চেয়েও নিচু কাজ, শুধু টেব্‌ল মোছা আর থালা-গেলাশ ধোওয়া, এটা কি একটা বলার মতন পরিচয়? ইকোনমিক্‌সে এম এ ক্লাসের ছাত্র ছিল সে, ঢাকাতে তার একটা বংশমর্যাদা আছে, ঢাকায় ব্রিটিশ কাউনসিলের হলে মূকাভিনয় দেখিয়ে কত লোকের হাততালি পেয়েছে সে, প্যারিসেও সে পার্থদাদার সঙ্গে একটা শো করেছিল, সেই সেলিম নিছক জীবিকার জন্য এখানে চাকরেরও অধম!

grontthagar.weebly.com

তাছাড়া খদ্দেরদের সঙ্গে তো কথা বলারও অধিকার তার নেই। টিনার কাছে গিয়ে কথা বললে যদি জুলফিকার কিংবা হারুন চটে যায়? ওদিকে যাবে না সেলিম।

টিনার মনে হলো, তা হলে বোধহয় সেলিম নয়, অন্য কেউ। ওর মুখের সঙ্গে মিল আছে। এখন এত ফাঁকা, সেলিম হলে নিশ্চয়ই একবার এদিকে আসতো।

সেলিম সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে প্রায় দৌড়ে ফিরে গেল রান্নাঘরে।

আস্তে আস্তে টিনার মুখ থেকে মিলিয়ে গেল বিস্ময়, সে অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকালো।

॥ ৮ ॥

সেলিম লক্ষ করেছে, রাত বারোটার সময় মাহবুব মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ডিউটি শেষ হবার পর সে নিজের বিছানায় খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। হঠাৎ একসময় ধড়মড় করে উঠে সে জামা-প্যান্ট পরতে শুরু করে। ফেরে ভোর রাতে।

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়, কিন্তু মাহবুব নিজের থেকে কিছু বলে না বলে সেলিমও জিজ্ঞেস করতে পারে না। ঘরের অন্য বাসিন্দারাও এটা জানে, শেষ রাতে যখন সে ফেরে, চাবি দিয়ে দরজা খোলায় খুট করে একটা শব্দ হয়, তা ছাড়া এই বেসমেন্টের ঘরের দরজার পাল্লাটা খোলার সময় ক্যাঁচ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ হয়, তখন সেলিমের মতন আরও দু' একজনের ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু কেউ বিরক্তিও প্রকাশ করে না, মন্তব্যও করে না কিছু।

এক এক রাতে এই ঘরে তাস খেলার আসর বসে। নিছক খেলা নয়, তাসের জুয়া। এরা যা টিপ্‌স পায়, তা জুয়ার আসরে হাত বদল হয়। সেলিমকে ওরা খেলতে ডাকে না কারণ ওরা জানেই যে সেলিমের টাকা নেই, সে তো আর টিপ্‌স পায় না। প্রায়ই খদ্দেররা উঠে যাবার সময় টেবলের ওপর কয়েকটা ডলার ও কিছু খুচরো রেখে যায় টিপ্‌স হিসেবে, টেব্‌ল মুছতে গিয়ে প্রথম একদিন সেরকম কয়েকটা ডলার হাতে তুলে নিতেই পেছন থেকে আজিজুল এসে বলেছিল, আ্যাই পুঙ্গিরপুত, ওতে হাত দিবি তো টুটি চেপে শেষ করে দেবো!

নিয়ম অনুযায়ী যে খাবার সার্ভ করবে, সে-ই টিপ্‌স পাবে, একজন টেব্‌ল-মোছা নোকরের তাতে কোনো অধিকার নেই।

ওরা তাস খেলে, সেলিম বসে বসে দেখে। এই জুয়া খেলা সে জানতো না, এখন দেখতে দেখতে অনেকটা বুঝে গেছে, কিন্তু খেলার তো পয়সা নেই। সে দেখেছে, আজিজুলই জেতে সবচেয়ে বেশি। মিন্টু নামে একটি ছেলে নিয়মিত হারে। মাহবুব সাবধানী, জিতলে বেশিক্ষণ বসে, হারতে শুরু করলেই ঘন ঘন তাস ফেলে দেয়,

হার জিৎ সমান সমান হলেই সে উঠে পড়ে।

মাহবুব ছাড়া এই মিন্টুর সঙ্গে সেলিমের কিছুটা ভাব হয়েছে। আজিজুল, হাসান আর সাবের এই তিনজন প্রথম প্রথম তার ওপর বেশ অত্যাচার করেছে, তাকে শুতে দিয়েছে বাথরুমের দরজার কাছে, তার জামা দিয়ে পা মুছেছে। হাসানের মুখ খুব খারাপ, সেলিমের শুধু ফর্সা রং বলেই যে কত কুৎসিত কথা বলেছে সে, তার ইয়ত্তা নেই। মাহবুব সব সময় দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে। আর মিন্টু এদিকেও না, ওদিকেও না, সে চুপচাপ থাকে। মিন্টুর সঙ্গে সেলিমের একদিক থেকে মিলও আছে, মিন্টু কবিতা লেখে, অর্থাৎ সেও শিল্পী।

ঢাকার দু'চারটি পত্র-পত্রিকায় মাহমুদুর রহমান মিন্টুর কবিতা দেখেছে সেলিম। আর সে শুনেছিল, এই কবি আমেরিকায় চাকরি করে। সেই চাকরি যে এই চাকরি, তা ঢাকার কেউ জানে না!

এক একদিন মাহবুব খেলা ছেড়ে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে যায়। কেউ কোনো প্রশ্ন করে না। সেলিম শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

এটা যে নারী-ঘটিত অভিযান নয়, তা বোঝা যায়। তার মধ্যে লুকোচুরি কিছু নেই। সাবের কিংবা হাসানের যেদিন ডিউটি থাকে না, সেদিন তারা সেজেগুজে মেয়ে-শিকারে বেরোয়। ফিরে এসে সাড়ম্বরে গল্প করে। গল্প করাটাই যেন আসল ব্যাপার। রেস্তোরাঁর দুটি মেয়ে জুডি আর লিজির সঙ্গেও ফস্টিনস্টি চলে, ওরা কারুকে না কারুকে মাঝে মাঝে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে ডাকে, তাতেও লুকোছাপার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এখানে কেউ কারুর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামায় না।

granthagar.weebly.com

জুডি কিংবা লিজি সেলিমকে একদিনও ডাকেনি, বরং সেলিমকে দেখলেই তারা হাসি-ঠাট্টা করে। আজিজুল রটিয়ে দিয়েছে, সেলিম জুলফিকারের শয্যাসঙ্গী, জুলফিকারের নজর পড়লে কেউ ছাড়া পায় না। আসল সত্য অবশ্য এই যে, জুলফিকার সেলিমের প্রতি খানিকটা সদয় ব্যবহার করলেও তাকে কখনো কুপ্রস্তাব দেয়নি, তার নিজের ঘরে ডাকেনি। সে রকম অবস্থা হলে সেলিমকে চাকরি ছেড়ে পালাতে হবে।

রেস্তোরাঁ আর এই বেসমেন্টের ঘরে, এর বাইরে এখনো কোথাও যায় না সেলিম। হারুন তাকে সাবধান করে দিয়েছে। রাস্তার কোনো গণ্ডগোল, এমনকি অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে পড়েও পুলিশের নজরে এলে তার বিপদ হবে। আলম সাহেব চেষ্টা করছেন তার

ওয়ার্ক পারমিট জোগাড় করার, সে জন্য সেলিমকে একবার হয়তো ক্যানাডায় পাঠাতে হবে।

একদিন মিন্টুকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, মাঝ রাত্তিরে মাহবুব কোথায় যায় বলতে পারো ?

মিন্টু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল তার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, ছাগলছানা কেন মরে জানো ? নদীর ধারে একটা পোড়া কাঠ দেখে ওটা কী, ওটা কী বলে লাফাতে লাফাতে সেটার একেবারে ধারে চলে আসে। তখনই পোড়া কাঠটা একটা কুমির হয়ে ছাগলছানার ঠ্যাং কামড়ে ধরে। বেশি কৌতূহল দেখাতে গেলে প্রাণটা চলে যেতে পারে, বুঝলে !

এটা একটা ধাঁধার মতন শোনালো, তবু সেলিম যেন খানিকটা মানে বুঝতে পারলো। ভয়ে তার বুকটা ছমছম করে।

এর মধ্যে মাহবুব একদিন জ্বরে পড়লো। ডাক্তার দেখাবার কোনো প্রশ্ন নেই। মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স না থাকলে চিকিৎসার অনেক খরচ। এই প্রবল শীতের রাতেও মাহবুব পায়ে হেঁটে বাইরে বেরোয়, তাতেই ঠাণ্ডা লেগে গেছে। অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে সে শুয়ে রইলো।

gronthagar.weebly.com

পরদিন তার জ্বর বাড়লো খুব, সর্বাঙ্গে কাঁপুনি। তবু সে ডাক্তারের কাছে যাবে না। এদেশে গরিবদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় নেই। যার মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স নেই তাকে দুর্ভোগ সহ্য করতেই হবে। মাহবুবের কাছে কে থাকবে, সবারই ডিউটি আছে। খবর পেয়ে হারুন সেলিমের ছুটি করে দিল।

দেশে থাকতে বেশি জ্বরের রুগীকে জলপট্টি দিতে দেখেছে সেলিম। একটা ন্যাকড়া জোগাড় করে মাহবুবের কপালে জলপট্টি লাগিয়ে পাশে বসে রইলো।

গতকাল থেকেই মাহবুব কিছু খায়নি। ডাকলেও ভালো করে সাড়া দেয় না, আচ্ছন্নের মতন অবস্থা।

ওরা দু' বেলাই রেস্তোরাঁয় খায়। সেখান থেকে কোনো খাবার আনা নিষেধ, কিচেনে বসে খেতে হবে। এই ঘরে রান্নার কোনো ব্যবস্থাই নেই, সেই শর্তে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। শুধু চা-বানাবার জন্য একটা স্পিরিট ল্যাম্প আছে, দুধ আর বিস্কিটও থাকে। এ দেশে সবাই ঠাণ্ডা দুধ খায়।

সেলিম দু'তিনবার জিজ্ঞেস করলো, মাহবুব, একটু দুধ খাবে ? চা বানিয়ে দেবো ?

মাহবুব কোনো উত্তর দেয় না।

চুপ করে পাশে বসে থাকা ছাড়া আর কী করার আছে, সেলিম ভেবে পায় না। খানিক পরে পরে সে জলপট্টি বদলে দেয়।

একসময় মাহবুব হঠাৎ প্রলাপ বকতে শুরু করলো।

অসংলগ্ন, টুকরো টুকরো কথা, তবু মাহবুবের একেবারে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে সেলিম বোঝার চেষ্টা করলো। না, মাহবুব এখন আমেরিকায় নেই, সে দেশে ফিরে গেছে। সে বলছে, দায়ুদকান্দি, দায়ুদকান্দির ফেরিঘাট, তুমি আমাদের থাবড় মারলা ক্যান ? আমি কী দোষ করছি ? তুমি পুলিশে কাম করো, তোমার শ্বশুর বড় একখান লিডার, তুমি ভাবো তুমি যা খুশি করতে পারো ? আমি সাইকেলডা সরাই নাই, তুমি আমারে থাবড় মারলা ? আমি মানুষ না, তেলাচোরা ? ছারপোকা ? আমার দুই ভাই মুক্তিযোদ্ধা আছিল, রক্ত দিছে প্রাণ দিছে, আর আমি ছারপোকা ? তোমাকে চিনে রেখেছি, আমি ফিরে যাবো, ঠিক একদিন ফিরে যাবো, আবার একটা মুক্তিযুদ্ধ হবে। সেদিন দেখিস শালা...

হঠাৎ কথা থামিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সেলিম ভয় পেয়ে তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডাকতে লাগল নাম ধরে। মাহবুবের কোনো বোধ নেই, সে একটা অসহায় শিশুর মতন কাতর ভাবে চিৎকার করতে লাগলো, মা, মাগো, ওমা, মা, আমারে দ্যাখো, মা, মাগো —

granthagar.weebly.com

মাহবুব বেশ শক্ত ধরনের মানুষ। সাধারণত কথাবার্তায় তার আবেগ থাকে না। সে যে এমন ভাবে কাঁদতে পারে, এটা যেন কল্পনাই করা যায় না। কোথায় কত দূরে মাহবুবের মা, এখানে মাহবুব জ্বরে বেহুঁশ, তিনি জানতেও পারছেন না কিছু ..., যদি মাহবুব হঠাৎ মারা যায় ? জীবনময় স্যার যেমন এখানে মাটি নিলেন !

বেশ খানিকটা কান্নার ফলেই যেন মাহবুব খানিকটা সুস্থ হলো।

একটু পরে উঠে বসে, চোখ সরু করে দেখে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললো, কে রে, সেলিম ? অন্ধকারে বসে আছিস কেন ? বাতি জ্বালিসনি ?

সেলিম আশ্বস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আলোর সুইচ টিপে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এখন একটু ভালো লাগছে ? খিদে পায়নি ?

মাহবুব দু'দিকে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো।

সেলিম আবার জিজ্ঞেস করলো, একটু দুধ খাবে ?

মাহবুব তার উত্তর না দিয়ে বললো, এখন কটা বাজে ?

—সাড়ে ছ'টা।

—সাড়ে ছটা? সন্ধ্যা সাড়ে ছটা? কত তারিখ।

—আঠারো তারিখ।

—অ্যাঁ? আঠারো তারিখ? কাল ছিল সতেরো? কাল রাত্তিরে, কাল রাত্তিরে আমি কোথায় ছিলাম?

—বাসাতেই ছিলে। খুব জ্বর, ঘুমিয়ে ছিলে।

—সর্বনাশ!

মাহবুব খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলো। একটু পরে মাথা তুলে ক্লিষ্ট গলায় বললো, সেলিম, তুই আমার একটা উপকার করবি? একটা কাজ করে দিতে হবে!

সেলিম বললো, নিশ্চয়ই করবো। কী কাজ বলো।

মাহবুব বললো, একটা জিনিস দেবো, একটা ছোট প্যাকেট, এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবি?

সেলিম মাহবুবের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, না।

মাহবুব বললো, তুই আমার জন্য এই একটা সামান্য কাজ করে দিবি না? শালা, তোকে প্রথম দিন আমার বিছানায় শুতে দিয়েছি। তোকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি!

granthagar.weebly.com

সেলিম বললো, অন্য যে-কোনো কাজ হলে পারতাম। কিন্তু এটা পারবো না। ও জিনিস আমি ছুঁতে পারবো না।

—কী জিনিস তুই জানিস?

—জানি। ড্রাগ।

—কে বললে তোকে?

—কেউ বলেনি। বোঝা খুব শক্ত? মাহবুব, তুমি বুঝে দ্যাখো, আমি এখনো সব রাস্তাঘাট চিনি না। যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ি, শুধু জেলে দেবে না, আমার কাগজপত্র দেখবে, সোজা দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আমি ধরা পড়লে তোমাদেরও বিপদ!

—আমি বিপদের পরোয়া করি না। ঠিক আছে, তোকে যেতে হবে না!

মাহবুব দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালো। তার চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ, মাথার চুল খাড়া-খাড়া, গায়ে এখনো একশো তিন জ্বর। পর্দার আড়ালে সে গেল পোশাক বদলাতে।

সেলিম পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী করছো, মাহবুব?

মাহবুব গম্ভীরভাবে বললো, আমাকে বাইরে যেতে হবে।

—পাগল হয়েছো নাকি ? তোমার গায়ে এখনো এত জ্বর, দু'দিন কিছু খাওনি, এই অবস্থায় বাইরে যাবে কী ?

—যেতেই হবে, সরে যা !

—মাহবুব, প্লিজ, এরকম পাগলামি করো না ।

—আরে ইডিয়েট, আমি না গেলে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে ! ভাববে আমি বিট্রে করেছি। বিট্রেয়ারদের ওরা একদিনও সময় দেয় না ।

—বাঃ, তা বলে তোমার অসুখ বিসুখ হতে পারে না ?

—জ্বর আবার অসুখ নাকি ? পেটে গুলি লাগলেও যেতে হবে ।

—ঠিক আছে, আমায় দাও। শুধু এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া তো ?

—নাঃ, তুই পারবি না, বুঝে গেছি। তোকে জড়াতেও চাই না।

কিছুতেই আটকানো গেল না মাহবুবকে। সারা শরীর তার কাঁপছে, তবু সে বেরুবেই। সেলিম ঝটপট জুতো-মোজা পরে নিল।

মাহবুব বললো, তুই সাজছিস কেন, গাধা ? দু'জনে ধরা পড়ার কোনো মানে হয় ? ঠিক আছে, তুই আমাকে একটু ধরে ধরে বাস স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিবি চল। তারপর আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক ফিরে আসবো।

বাইরে তুষার ঝড় বইছে। রাস্তায় একটাও পায়ে হাঁটা মানুষ নেই। ওভারকোটে কান পর্যন্ত ঢেকে দু'জনে কাঁধ ধরাধরি করে চললো। যেন দোলায়মান দুটি ছায়ামূর্তি।

মাহবুব বাসে উঠে পড়ার পরেও সেলিম রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। বুকের মধ্যে এলোপাথাড়ি বাতাস। খালি মনে হচ্ছে, মাহবুবের সঙ্গে আর দেখা হবে না, মাহবুব বলেছিল, পেটে গুলি খেলেও যেতে হবে। মাহবুব যদি ধরা পড়ে, তা হলে কি আগ্রা রেস্তোরাঁর অন্য কর্মচারীদের ওপরেও পুলিশ হামলা করবে না ?

বাসায় ফিরে আসার পর অন্যরা কেউ মাহবুব সম্পর্কে একটাও প্রশ্ন করলো না। এই নীরবতাও বিস্ময়কর। এরা কি সবাই জানে, মাহবুব কাদের হয়ে ড্রাগ পাচার করে ? তারা এমনই ভয়ংকর ? সারা রাত জেগে রইলো সেলিম।

ভোর রাতে অবশ্য ফিরে এলো মাহবুব। তারপর আরও দিন পাঁচেক জ্বরে পড়ে রইলো সে। ওষুধপত্রে সে বিশ্বাস করে না। নিছক বাঁচার অদম্য স্পৃহাতেও সে সুস্থ হয়ে উঠলো আবার।

একদিন নিরিবিলিতে পেয়ে মাহবুবকে সেলিম জিজ্ঞেস করলো, এই কাজ এত বিপজ্জনক জেনেও তুমি জড়িয়ে পড়লে কেন, মাহবুব ?

মাহবুব মুখ ভেংচিয়ে বললো, ইডিয়েট, কেন করি তা বুঝিস না ? টাকার জন্য ! টাকা, টাকা চাই আমার। অনেক টাকা !

—তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

—কার না প্রাণের ভয় আছে। প্রাণটা বাঁচাবার জন্যই তো সব কিছু। তবু ঝুঁকি নিতে হয়। টাকার জন্য মানুষ আগুনেও ঝাঁপ দেয়।

—কিন্তু এত কিসের টাকার দরকার। টিভি-তে দেখেছি, ড্রাগের জন্য পুলিশ যদি ধরে, গোটা গ্যাংটাকে ধরার জন্য কী সাঙ্ঘাতিক পিটায়।

—আর যারা ধরা পড়ে না ?

—আমরা বিদেশি, আমাদের ওপরেই তো পুলিশের বেশি নজর।

—তোরে তবে ভালো করে বুঝিয়ে বলি। 'পদ্মা নদীর মাঝি' বইখানা পড়েছিস ?

—নাম শুনেছি, পড়ি নাই।

gronthagar.weebly.com

—সেই বইতে হোসেন মিঞা নামে একটা ক্যারেক্টার আছে। তার একটা বিরাট স্বপ্ন ছিল। সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ, সেখানে সে নিজস্ব মানুষজন নিয়ে গিয়ে বসাবে, সেখানে তারা চাষবাস করে সোনা ফলাবে, কেউ কারুকে ঠকাবে না, ধর্ম নিয়ে কাজিয়া করবে না, মন্দির-মসজিদ থাকবে না, বড় সুন্দর একটা সমাজের স্বপ্ন। একটা পুরো দ্বীপে অতগুলি মানুষের বসতি স্থাপন করতে গেলে তো অনেক টাকা লাগে। সে টাকা হোসেন মিঞা পাবে কোথায় ? তাই সে স্মাগলিং করতো। একটা মহৎ কাজের জন্য যে-কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করা যায়।

—তুমি দেশে ফিরে গিয়ে ওই রকম একটা দ্বীপে—

—ছাগলের নাদির মতন কথা বলিস না, সেলিম। কাঁধের ওপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা কি শুধু খাদ্য চিবাবার জন্য ? চিন্তাভাবনা করে কথা বলতে হয়। দ্বীপটা হলো একটা সিম্বল, একটা প্রতীক। আমাদের বাংলাদেশটাই তো সেই দ্বীপ। তাকে সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ করতে হবে না ? তার জন্য আর একটা মুক্তিযুদ্ধ শুধু করা দরকার। বিশ্বাসঘাতক, মতলববাজ, জীবন্ত শয়তানগুলোকে শেষ করে দিতে হবে। আর একটা মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া হবে না।

—তুমি একা কী করে তা পারবে, মাহবুব ? ড্রাগ পেডলিং করে কত টাকাই বা জমাবে !

—একা কেন ? আমার মতন হাজার হাজার বাংলাদেশের ছেলে ছড়িয়ে আছে এ দেশে। জার্মানিতে আছে, ইংল্যান্ডে আছে। সবাইকে ডাক দেবো। সবাইকে বলবো, এই ধনতন্ত্রের দেশে সারা জীবন গোলামি করবি ? সাহেবদের পা চাটবি ? আমরা এখানে থার্ড ক্লাস সিটিজেনেরও অধম। থার্ড ওয়ার্লড কান্ট্রির লোক মানেই থার্ড ক্লাস। পুলিশ দেখলেই বুক কাঁপে। নিজের দেশে বুক ফুলিয়ে হাঁটার কথা, এ দেশে এসে চোর হয়ে গেছি ! একজন কারুকে তো শুরু করতে হবে। আমি কিছুতেই এ দেশে আর বেশিদিন থাকতে চাই না।

—দায়ুদকান্দিতে কে তোমাকে অপমান করেছিল ?

—তুই কী করে জানলি !

—তুমি জ্বরের ঘোরে কী যেন বলছিলে।

—ছাড় ও কথা। শোন সেলিম, তোকে একটা কথা বলি। সবাই সব জিনিস পারে না। তুই নরম-সরম মানুষ, তুই ড্রাগ-ফ্রাগের মধ্যে যাস না, মারা পড়বি। কিন্তু তোকেও ওরা অ্যাপ্রোচ করতে পারে।
granthagar.weebly.com
রেস্টুরেন্টের খদ্দের সেজে ওরা আসে। আগে সাউথ আমেরিকার লোকরাই এ ব্যবসাটা চালাতো, এখন তাদের ওপর পুলিশের খুব কড়াকড়ি। সেই জন্য থার্ড ওয়ার্লডের লোকদের দিয়ে মাল পাচার করাচ্ছে। তাতে ওদের শস্তাও হয়। আমরা তো কুড়ি-পঁচিশ ডলার পেলেই ধন্য হয়ে যাই, মনে মনে ডলারকে টাকা দিয়ে গুণ করি। কোনো খদ্দের যদি তোকে বাইরে কোথাও দেখা করতে বলে, তুই কিছুতেই যাবি না, না-শোনার ভান করে সরে যাবি।

সেলিম কোনো খদ্দেরের সঙ্গে কথাই বলে না। মাহবুবের কাছ থেকে ওই কথা শোনার পর সে খদ্দেরদের আরও ভালো করে লক্ষ করে। কতরকম মানুষ আসে, এর মধ্যেই কেউ ড্রাগ স্মাগলিং চক্রের নায়ক ? কী রকম দেখতে হয় ওই সব লোকদের। লক্ষ লক্ষ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বনাশ করতে তাদের বিবেকে বাধে না ! শ্বেতাঙ্গরাই এখানে বেশি খেতে আসে। অধিকাংশই সুসজ্জিত। ধীর স্বরে কথা বলে, ওয়েটাররা তাদের ইংরিজি বুঝতে না পারলেও রাগ করে না, হাসে। একদিন একটি আমেরিকান দম্পতি প্রায় নিখুঁত বাংলা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ওরা দু'জনেই

ঝিনাইদহে ছিল বেশ কয়েক মাস।

না, সেলিমকে কোনো খদ্দেরই বাইরে দেখা করার কথা বলে না। মেয়েরা তার দিকে একটু বেশি তাকায়। মিন্টু, আজিজুল, মাহবুবদের তুলনায় সেলিম অনেক বেশি সুদর্শন তা সে নিজেও জানে। কিন্তু চেহারা দিয়ে কী হয় ? তার কাজ টেব্‌ল মোছা। এর চেয়ে আর উন্নতির আশা নেই। মেয়েদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেও সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। একমাত্র যে মেয়েটির কাছে তার ছুটে যাওয়া উচিত ছিল, সেই মেয়েটি ডাকলেও সেলিম কথা বলেনি। টিনার কথা মনে পড়লেই সেলিমের বুকটা ভারী হয়ে আসে।

একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

একটা টেব্‌লে জনা-চারেক খদ্দের আড্ডা মারছে অনেকক্ষণ ধরে। তারা শ্বেতাঙ্গ নয়, পাকিস্তানী-ভারতীয়-বাংলাদেশী যা হোক হতে পারে। তারা কথা বলছে হিন্দি বা উর্দুতে, দু'জন মাঝে মাঝে বাংলাও বলছে। এরা স্থানীয় নয়, স্থানীয়রা মোটামুটি মুখ চেনা হয়ে গেছে এতদিনে। খুব সম্ভবত এরা গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে এখানে থেমেছে।
granthagar.weebly.com
চারজনের মধ্যে তিনজনই মদ্যপান করছে প্রচুর, একজন শুধু একটা বীয়ার নিয়ে বসে আছে। সে-ই নিশ্চয়ই গাড়ি চালাবে। একসঙ্গে খাবারের অর্ডার না দিয়ে ওরা একটার পর একটা প্লেট চাইছে। রেস্তোরাঁ প্রায় বন্ধ হবার মুখে।

গেল, কী দোষ করেছে সে ? সে একটি অকিঞ্চিৎকর মানুষ, সর্বক্ষণ সঙ্কুচিত হয়ে নিজের অস্তিত্বটাকেও লোপ করার চেষ্টা করে ঘুরে বেড়ায়, তার ওপর একজন খদ্দেরের রাগের কী কারণ থাকতে পারে ? অথচ লোকটা বারবার দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। সেই দৃষ্টি যেন সেলিমের গায়ে বিঁধছে।

এই কি তা হলে ড্রাগের লোক ? সেলিম কাছে যাচ্ছে না বলে রাগ করছে ? ড্রাগ চক্রের আসল মালিকরা খুব বড়লোক হয়, তারা তো সাহেব ? এ কি সাহেবদের এজেন্ট ? নেপাল, পাকিস্তান থেকেও নাকি ড্রাগ আসে।

বিল মিটিয়ে ওঠার সময় সেই লোকটি হাতছানি দিয়ে সেলিমকে ডেকে বললো, এই, এদিকে শুনে যাও।

সেলিমকে বাধ্য হয়েই কাছে যেতে হলো।

লোকটি উগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী ?

সেলিমের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই সে লোকটিকে ভয় পেতে শুরু করেছিল, এই মুহূর্তে তার মনে হলো, ওকে আসল নামটা বলা ঠিক হবে না।

সেলিম বললো, জাহাঙ্গীর।

grontoagar.weebly.com

বলেই এদিক ওদিক তাকালো। আর কেউ কি শুনতে পেয়েছে ?

তখনই চেইঞ্জ নিয়ে ফিরে এলো আজিজুল। সেলিমকে আড়াল করে সে দাঁড়ালো টেবিলের সামনে।

সেই ঘাড়-মোটা লোকটি আর কিছু বললো না। দরজার কাছে গিয়ে ওভারকোট পরতে পরতে আবার সে একবার গরম চোখে সেলিমের দিকে তাকালো।

ব্যাপারটা সেলিমের কাছে ধাঁধা হয়েই রইলো।

কেন লোকটা অত ক্রুদ্ধ চোখে তাকাচ্ছিল ? সেলিম নিজের আসল নাম বলে ফেললে কী হতো ? ওর চেনা কোনো লোকের সঙ্গে সেলিমের চেহারার খুব মিল ?

এই ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেল দু'দিন পরে।

রেস্তোরাঁ বন্ধ হবার পর ওদের ঘরে তাসের জুয়ার আসর বসেছে। মাহবুব আজ আর বাইরে যায়নি, সেও মেতে উঠেছে খেলায়। আজিজুলের কাছে মদের বোতল। রেস্তোরাঁতে ডিউটির সময়ও সে লুকিয়ে চুরিয়ে একটু-আধটু ড্রিংক করে, এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি। সন্ধের পর থেকে সে একটু না খেয়ে থাকতে পারে না। এক একদিন রাত্তিরে ঘরে বসে অনেকখানি নেশা করে ফেলে।

আজও আজিজুলের যথেষ্ট নেশা হয়েছে। হারছেও যথেষ্ট। হঠাৎ সে একসময় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, আ্যাই শালা সেলিম, তুই আজ খেলবি আয়। খেলবি না কেন ?

প্রথম প্রথম সেলিম মাহবুব কিংবা মিন্টুর পাশে বসে খেলা দেখতো। এখন আর উৎসাহ বোধ করে না। অন্যরা যখন খেলে, তখন সে একটু দূরে শুয়ে শুয়ে কোনো বই পড়ে। এত চ্যাঁচামেচির মধ্যে ঘুমোনো অসম্ভব।

সেলিম বললো, আমি ? আমি কী করে খেলবো। খেলা জানিই না !

আজিজুল বললো, উঠে আয়, শালা, তোকে শিখিয়ে দেবো ! আমরা সবাই খেলছি, আর তুই বিদ্যে বাড়াবি ?

সেলিম বললো, আমার পয়সা নেই !

আজিজুল এবার ভেঙচি কেটে বললো, পয়সা নাই। তুই টিপ্সের পয়সা রেগুলার চুরি করোস না ? আমি বুঝি দেখি না ?

মাহবুব প্রতিবাদ করে বললো, মিথ্যে কথা। সেলিম পয়সা সরায় না।

আজিজুল বললো, তোরা জানোস না। ওডা মিচকা শয়তান। দ্যাখলে মনে হয়, ভাজা মাছটা উইল্টা খাইতে জানে না।

granthagar.weebly.com

আজিজুলের সঙ্গে সেলিমের তেমন ভাব হয়নি বটে, কিন্তু হঠাৎ তার এত রাগের কারণ কী ? শুধু মাতলামির ঝোঁক ? সেলিম অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ওর দিকে।

মাহবুব বললো, আমাদেরই উচিত, যার যার টিপ্স থেকে ওকে কিছু কিছু দেওয়া। ও বেচারা টেবিল পোঁছে, ও তো কিছুই পায় না।

আজিজুল সে কথায় কান না দিয়ে বললো, এই সেলিম, ইদিকে আয়, উঠে আয়, শিগ্গির আয়, না হলে তোর ঘেঁটি ধরে তুলে আনবো !

সেলিম বইটা রেখে তাস খেলার আসরের কাছে গিয়ে বসলো।

আজিজুল বললো, শোন, তোরে একটা গল্প বলি !

মিন্টু বললো, আরে রাখ তোর গল্প ! খেলবি কিনা বল ?

আজিজুল তবু সেলিমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুই আওয়ামি লীগ, না বি এন পি ?

মাহবুব বললো, ওসব পলিটিকসের কথা এখন ছাড় তো ! এই বিদেশে আমরা বাংলাদেশের মানুষ সবাই এককাট্টা !

মিন্টু বললো, অত কি সহজ রে ভাই! রেস্টুরেন্টে আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক যখন প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাপোর্টে কথা বলে, তখন আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে। হারামির বাচ্চা রাজাকারগুলা এদেশে আসলে তাদের সাথে গলাগলি করবো? রাজাকাররা আমার আপার ইজ্জত নিছে, আমাগো বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিছিল!

মাহবুব বললো, নাঃ, আজ আর খেলা হবে না। এদেশে বসে রাগারাগি করলে কী হবে? দেশে ফিরে গিয়ে রাজাকারদের সাথে আবার লড়াই শুরু করার হিম্মত থাকে তো বল!

আজিজুল এসব কথা শুনছে না। সে একদৃষ্টিতে সেলিমের দিকে চেয়ে আছে। সে বললো, তোরা আমার গল্পটা শোন না!

মাহবুব বললো, রাখ তোর গল্প। আমি শুইতে চললাম!

আজিজুল ঝুঁকে তার হাত ধরে বললো, দুই মিনিট। গল্পটা শুনে রাখ, সকলের কাজে লাগবে!

হুইস্কির বোতল থেকে একটা লম্বা চুমুক দিল সে।

তারপর ঠোঁট মুছে বললো, বাল্টিমোর শহরে একটা হালাল গোস্তের দোকান আছে। সেই দোকানের মালিকের নাম ইলিয়াস। বেশ চালু দোকান। এই ইলিয়াস কে জানোস? একাত্তরের যুদ্ধের সময় নারায়ণগঞ্জে শান্তি কমিটির পাণ্ডা আছিল। আল বদর বাহিনী ছিল ওর হাতে। কত মানুষের যে সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নাই। বহু টাকা পয়সা লুট করেছে। যুদ্ধ থামার পর এ দেশে পালিয়ে আসে। এখানেও ওর হাতে দলবল আছে।

মাহবুব জিজ্ঞেস করলো, তুই তারে চিনলি ক্যামনে?

আজিজুল বললো, বাকি গল্পটা শোন। ওই ইলিয়াসের এক ভাইয়ের নাম বশির, ঢাকায় সে ছিল এক এরশাদপন্থী ছাত্রনেতা। ইলিয়াস তার সেই ভাইরে স্পনসরশিপ দিয়া এখানে নিয়া আসবে, প্রায় সব ঠিকঠাক, এমন সময় বশির খুন হয়ে গেল। আড়াই-তিন বছর আগেকার কথা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুই দল ছাত্রের মারামারির সময় একজন তারে গুলি করে। ইলিয়াস এর মধ্যে তিনবার ঢাকায় গেছে। তার ভাইয়ের মার্ডারারকে খুঁজে বার করে সে প্রতিশোধ নেবেই।

আবার সে বোতলে চুমুক দেবার জন্য একটু থামলো। সবাই চুপ, উদ্‌গ্রীব।

আজিজুল আবার বললো, এইটুকু সে জেনেছে যে তার ভাইয়ের

মার্ডারার এখন আমেরিকায় লুকিয়ে আছে। তার নাম সেলিম। তাকে যদি ইলিয়াস একবার চিনে ফেলতে পারে—

না, না, না বলে সেলিম চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

দু'হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আমি মারিনি। আমি মারিনি। তোমরা বিশ্বাস করো, খোদার কসম, আমি বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি কখনো! আমার নামে মিথ্যামিথ্যি পুলিশ কেস করেছে। তোমরা অন্তত বিশ্বাস করো—

শিশুর মতন কাঁদতে লাগলো সেলিম। বাকি সবাই নিঃশব্দে চেয়ে রইলো নীচের দিকে।

আমেরিকার মিড ওয়েস্টের একটি ক্ষুদ্র শহরে, একটি বাড়ির বেসমেন্টে বসে আছে ওরা, কিন্তু ঘিরে রয়েছে ঢাকা শহরের রাজনীতি, প্রত্যেকের মন এখন নিজের মাতৃভূমিতে।

হঠাৎ মাহবুব এক লাফ দিয়ে উঠে আজিজুলের টুঁটি চেপে ধরে বললো, শালা, তুই এত সব জানলি কী করে? তুই চিনিয়ে না দিলে সেলিমকে কে চিনবে? কত মানুষের নাম সেলিম হয়। তুই যদি কোনোদিন বিট্রে করিস, তা হলে আমি তোর কলিজা ছিঁড়ে নেবো।

অন্যরা জোর করে মাহবুবকে টেনে সরিয়ে দিল।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে আজিজুল বললো, হাতে বড় বড় নোখ হয়েছে তোর মাহবুব! নেইল কাটার নাই বুঝি? আমি তো ওরেই সাবধান করে দিলাম। সেলিম আমাকে পছন্দ করে না, আমার সাথে ভালো করে কথা বলে না, নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল মনে করে। তবু আমি ওর সাইডে। আমি রাজাকারদের সাইডে কোনোদিনই যাবো না।

grontho...weebly.com

॥ ৯ ॥

প্রথমে দেখা যায় একটা ঘাসফুল।

পথের দু'ধারের ঘাস প্রায় তিন-চার মাস বরফে চাপা পড়ে থাকে। এক এক সময় তিন-চার ফুট বরফ জমে যায়। এতখানি চাপেও কিন্তু ওরা মরে না, এমনই অদম্য প্রাণশক্তি। এপ্রিলের শুরুতে যেই বরফ গলতে শুরু করে, অমনি ঘাসেরা আবার মাথা চাড়া দেয়। বড় বড় গাছগুলিতে তখনও পাতা গজায় না, কিন্তু ঘাসেরা সবুজ হয়, ফুল ফোটায়।

রাস্তার ধারের ওই ঘাসফুল দেখেই বোঝা যায়, এবারের মতন শীত শেষ হলো, আসছে বসন্তকাল।

বসন্তের শুরুতেই সেলিম নতুন চাকরি পেয়ে গেল। এটাও সামসুল আলম সাহেবের কৃতিত্ব। এ চাকরিটা অনেক ভদ্রগোছের। একটা গ্রসারি স্টোরের কাউন্টার ম্যানেজার। এর মালিক বাংলাদেশী, হেনা ভাবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এতদিন মালিক নিজেই এই দোকানে বসতেন, এখন তিনি আর একটি জুয়েলারির দোকান খুলেছেন, সেখানে সর্বক্ষণ তাঁকে থাকতেই হয়। মালিকের নাম মনসুর আলি, অতিশয় সজ্জন, সেলিমকে দেখে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে।

দোকানটি আসলে মাঝারি আকারের একটি মুদিখানা, চাল-ডাল থেকে নানারকম প্রাচ্যদেশীয় মশলা ও আচার পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে বেগুন-ফুলকপি-পালং শাক-কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি কিছু শাক-সবজি, ডিপ ফ্রিজে কয়েকরকম মাছ। খদ্দেররা ইচ্ছেমতন বেছে নেয়, সেলিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কাউন্টারে, ক্যালকুলেটিং মেশিনে জিনিসগুলোর দাম দেখে হিসেব করে, ক্যাশ, চেক কিংবা ক্রেডিট কার্ড মিলিয়ে নিতে হয়। কাজ বেশ সোজা, কিন্তু ডিউটি সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা। খাবারের ব্যবস্থা নিজের।

মাঝে মাঝে কোনোই খদ্দের থাকে না, তখন ইচ্ছে করলে সেলিম বই পড়তে পারে। দরজার ওপরে এক সারি জিঙ্গল বেল টাঙানো আছে, কেউ দরজা ঠেলে ঢুকলেই টুংটাং শব্দ হয়। সেলিম তখন মুখ তুলে তাকিয়ে হাসে, একেবারে নতুন কোনো খদ্দেরকে ঢোকার পর ইতস্তত করতে দেখলে জিজ্ঞেস করে, মে আই হেল্প ইউ ?

granthagar.weebly.com

দোকানে আর একজন কর্মী আছে, তার বয়েস প্রায় সত্তর, সম্পর্কে মালিকের চাচা। সেই সুবাদে সেলিমও তাকে জসিমচাচা বলে। যে-কোনো কারণেই হোক মালিক তাকে ক্যাশ-কাউন্টারের ভার দেয়নি। বাইরে থেকে মালপত্র এলে ঠিকমতন জায়গায় সাজিয়ে রাখা তার কাজ, খদ্দেরদের জন্য কিছু কিছু জিনিস ওজন করেও দিতে হয় তাকে। মনসুর আলি দেশ থেকে অনেককে স্পনসরশিপ দিয়ে আনিয়েছেন, এই চাচাটিও সেরকম একজন, মনসুর আলির বাড়িতেই থাকে, খায়। কিন্তু সে জন্য কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। প্রায়ই সে সেলিমের কাছে মালিকের নিন্দে করে, সেলিম শুনতে না চাইলেও শোনাবেই। মালিকের ঢাকায় এক বউ, এখানে আর এক বউ। এখানকার বউ ইরানী। এখানকার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় মেয়েকে সবাই যদিও জুলি নামে ডাকে, আসলে তার নাম জুলেখা। মাত্র সতেরো বছর বয়েসে সে একটা স্প্যানিশ ছেলের সঙ্গে পালিয়ে

গিয়েছিল, বাপ-মা আর তার খোঁজও করলো না, কিন্তু এমনই নির্লজ্জ মেয়ে, নিজে নিজেই ফিরে এলো প্রায় এক বছর পর, সেই স্প্যানিশ ছোকরা তাকে ফেলে পালিয়েছে, এ দেশে এমন কত হয়, জুলি তখন সাত মাসের পোয়াতি ! এমন নিষ্ঠুর মেয়ে, সেই বাচ্চাটাকেও জন্মাতে দিল না, মেরেই ফেললো। এখন জুলি ড্যাং ড্যাং করে কলেজ যায়, আবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে। ইরানী বউটা মহা কৃপণ আর এমনই তার দাপট যে, মনসুর আলিকে পুতুল নাচ নাচায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে সব লুটেপুটে খাচ্ছে।

সেলিমের এক এক সময় মনে হয়, জসিমচাচার কোনো কথাটাই বোধহয় সত্যি নয়। জুলি অর্থাৎ জুলেখা এ দোকানে মাঝে মাঝে আসে। গায়ের রং ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু সাজ-পোশাক ও ভাব-ভঙ্গি একেবারে মেম সাহেবদের মতন। বাংলা প্রায় জানেই না। জানবেই বা কী করে, জন্ম এখানে, মা ইরানী, বাবার দেশ সে কখনো দেখেইনি। মেয়েটির মুখে একটা আশ্চর্য সারল্য রয়েছে। টানাটানা চক্ষু দুটিতে বিস্ময় মাখানো। এই মেয়ের যে এরই মধ্যে একবার গর্ভপাত ঘটে গেছে, তা বিশ্বাসই করা যায় না।

জুলি সঙ্গে দু' তিনটি বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে আসে। সেলিমের সঙ্গে কথা বলে খুব সহজভাবে। মালিক-কন্যাসুলভ বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। ফ্রিজ খুলে কোকের বোতল বার করে বন্ধুদের খাওয়ায়। সেলিমকে জিজ্ঞেস করে, তুমি একটা খাবে ? যাবার সময় সে বোতল গুণে গুণে দাম দিয়ে যায়।

granthagar.weebly.com

জসিমচাচার সঙ্গে সে দু'-একটা বাংলা বলার চেষ্টা করে। তার থুতনি ধরে নেড়ে মজা করে নানারকম। মনে হয় যেন দু'জনের খুব ভাব। অথচ জুলেখা দু'-চারদিন না এলেই জসিমচাচা ফিসফিস করে সেলিমকে বলে, জানো তো কী ব্যাপার ? জুলি আবার এক ব্যাটা দৈত্যের মতন নিগ্রোর সাথে ভেগেছে। কুত্তি কাঁহিকা। লাজ-লজ্জা কিছু নাই ! ওর বাপেও কিছু কয় না !

এই চাকরিটা বেশ পছন্দ হয়েছে সেলিমের। কোনো ঝঞ্ঝাট

প্রথম দু' মাস সেলিম মাহবুবদের বেসমেন্টের ঘর থেকেই যাতায়াত করছিল। কিন্তু এ দোকানটা বেশ দূরে, দু'বার বাস বদল করতে হয়, ভাড়াও লেগে যায় অনেক। এখন সে কাছাকাছি একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে গেছে, অ্যাটিকের ঘর, সত্তর ডলার ভাড়া। এখানে মাইনে পায় দুশো ডলার, তাতে তার চলে যাবে। নিজস্ব একটা যাবার জায়গা পেয়েই সেলিম সবচেয়ে খুশি।

রাত্তিরের দিকে সে মাহবুবদের আড্ডায় এখনো মাঝে মাঝে যায়। এর মধ্যে তার কিছু নতুন বন্ধু হয়েছে। এই গ্রসারি স্টোরের কাছেই একটা ইউনিভার্সিটি। সেখানকার কিছু কিছু ছাত্র ছাত্রী এখানে মশলাপাতি কিনতে আসে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার বাঙালি। রেস্টুরেন্টের কাস্টোমার আর এই সব ছাত্রদের মধ্যে অনেক তফাত। এই ছাত্রদের অনেক কাছের মানুষ মনে হয় সেলিমের। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইন্ডিয়ার বাঙালি, তবু বাংলা কথা শুনলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

জসিমচাচার কাছে জুলির নতুন বার্তা শোনা যায়। নিগ্রো বন্ধুর সঙ্গে জুলির লীলাখেলা ঘুচে গেছে, আবার সে ফিরে এসেছে, আবার পোয়াতি কিনা তা আল্লাই জানে। কোথায় গেছিলি, জিজ্ঞেস করলে বলে, বন্ধুদের সাথে ক্যালিফোর্নিয়া গেছিলাম ? এই কথা ঢাকায় যদি কোনো মেয়ে তার বাপকে বলতো, তাহলে ভাবো দেখি তার কী দশা হতো !

grontthagar.weebly.com

সেলিম হেসে বলে, এটা যে ঢাকা নয়, তা কি আপনি এখনো বোঝেন না জসিমচাচা ? এখানে ষোলো বছর বয়েস হলেই ছেলে-মেয়েরা স্বাধীন !

অনেকদিন পর জুলি আবার আসে দোকানে, তার চেহারা কিংবা ব্যবহারে কোনোই পরিবর্তন নেই। আগেরই মতন সরল, চঞ্চল। প্রায় দু' সপ্তাহ সে কোনো অতিকায় কালো মানুষের সঙ্গে যৌন জীবন কাটিয়ে এসেছে, তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

একদিন বাংলাদেশের দুটি ছাত্র ও ছাত্রী এসে অনেক কিছু কেনাকাটি করেছে। কড়াই, খুন্তি, বেলুন-চাকি পর্যন্ত যখন কিনলো, তখন বোঝা গেল যে, ওরা এখানে নতুন সংসার পাতছে। কাউন্টারে ওরা যখন দাম দিতে এসেছে, তখন মেয়েটি হঠাৎ বললো, আপনি, আপনি সেলিমভাই না ?

সেলিমের সর্বাঙ্গে একটা শিহরন হলো। সে পারতপক্ষে কারুকে নিজের নাম বলে না। অন্যের মুখে নিজের নাম শুনলে চমকে

ওঠে। সে মেয়েটির মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো।

মেয়েটি বললো, আমি ঢাকায় আপনার মাইম শো দেখেছি। ঠিক ধরেছি না ?

খ্যাতির একটা নিবিড় সুখ আছে। সেলিম অস্বীকার করতে পারলো না, হাসিমুখে মাথা নাড়লো।

মেয়েটি বললো, আপনি আমার বড়ভাইয়াকে চেনেন। কাশেম আলি বাচ্চু। ছাত্র ইউনিয়নের জেনারাল সেক্রেটারি ছিল। আপনি আমাদের ধানমুণ্ডির বাসাতেও এসেছেন। আমার নাম বীথি।

অন্য ছেলে দুটির মধ্যে একজন বীথির স্বামী, অন্যজন স্বামীর ছোটভাই। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বীথি দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বললো, তোমরা জানো না, সেলিমভাই একজন নামকরা আর্টিস্ট, ঢাকায় অনেক শো করেছেন। ভুট্টো আর ইয়াহিয়া খানের যে দারুণ ক্যারিকেচার দেখিয়েছিলেন।

বীথির স্বামী ইউসুফ বললো, আমাদের এখানে ক্লাব আছে। 'ঐকতান'। সেখানে আপনি একদিন শো করুন না !

সেলিম লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললো, দেখি, যদি সময় পাই—

ওরা হই হই করে বলে উঠলো, না, না, সময় করতেই হবে।

grontthagar.weebly.com

প্রায় ছ' মাস বাদে সেলিম এক সকালে দেখা করতে এলো শিখা-অনীশের সঙ্গে। এর মধ্যে আসবে আসবে করে আর আসাই হয়নি। ফোনে কথা হয়েছে মাত্র একবার। এঁরা হয়তো সেলিমকে অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। টিনাকে একদিন দেখেও যে সেলিম কথা বলেনি, তাও নিশ্চয়ই শুনেছেন। এ বাড়ির প্রত্যেকের কথা

বলেছিলেন, অনেকদিন খাননি। আর ভাবীর সোনামুগ ডাল খুব পছন্দ, এদিকে পাওয়া যায় না।

শিখা বললো, এনেছে বেশ করেছে। ও এখন ভালো চাকরি করছে, আমাদের একদিন খাওয়াবে, এ আর এমন কী কথা! আলম সাহেবের কাছে তোমার সব খবর পাই। একটা স্টোরের ম্যানেজার হয়েছো শুনেছি।

অনীশ জিজ্ঞেস করলো, ওয়ার্ক পারমিটের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

সেলিম বললো, না হয়নি। তবে, একটা কিছু হয়ে যাবে শুনছি!

শিখা হেসে বললো, আমরাও শুনেছি। তোমার যিনি বস, তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, জুলেখা। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তাকে বিয়ে করলে তুমি গ্রীন কার্ড পেয়ে যাবে!

সেলিম চমকে উঠলো। এটা তার কাছে নতুন তথ্য। জুলেখার সঙ্গে তার বিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে? মোটেই না। কেউ একবারও এ কথা উল্লেখ করেনি। সেলিম নিজেও ঘুণাক্ষরে এমন চিন্তা করে না।

সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রবিবার সকালে টিনার তো বাড়ি থাকার কথা। অথচ টিনার সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

growthagar.weebly.com

সেলিম এসেছে জানতে পেরে টিনা কি রাগ করে দেখাই করবে না?

মিনিট দশেক গল্প করার পর অনীশ উঠে দাঁড়ালো। সে আজ চুল কাটতে যাবে ঠিক করেছে। শিখাও একটু উসখুস করছে, আজ বাসবীর সঙ্গে তার শপিং করতে যাবার কথা। সেলিমের সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগছে, কিন্তু সে অন্য একদিন এলে পারতো না?

সেলিম ওদের ইঙ্গিত বুঝে তাড়াতাড়ি চা শেষ করলো। তারপর পকেটে হাত দিয়ে তিনখানা কার্ড বার করে লাজুক গলায় বললো, সামনের শনিবার আমার একটা শো আছে, আপনারা যদি দেখতে যান, এ দেশে আমার প্রথম পাবলিক শো।

কার্ডগুলো তুলে নিয়ে অনীশ বললো, দেখি, দেখি, কবে হচ্ছে, এই শনিবার? যাঃ! কী করে যাবো আমরা?

শিখা বললো, শনিবার কী যেন একটা আছে?

অনীশ বললো, চারুপ্রকাশ-অনীতার ছেলের গ্র্যাজুয়েশন উপলক্ষে পার্টি দিচ্ছে। সবাইকে ডেকেছে!

শিখা বললো, ওখানে যেতেই হবে, তাই না?

অনীশ বললো, বাঃ, যেতে হবে না? কবে থেকে বলে রেখেছে।

না গেলে ওরা খুব মাইন্ড করবে।

শিখা বললো, সত্যি, এই শনিবার তো যেতে পারবো না, সেলিম। যদি অন্য কোনোদিন করতে।

সেলিমের সামান্য অভিমান হলো। বন্ধুর ছেলের গ্র্যাজুয়েশন উপলক্ষে পার্টি মানে শুধু খাওয়া দাওয়া। সেটা এমন কিছু জরুরি ব্যাপার নয়। সেখানে না গিয়ে সেলিমের শো-তে এঁরা আসতে পারতেন না?

সেলিম বললো, কার্ডগুলো এনেছি যখন, রেখে গেলাম। যদি অন্য কেউ যায়।

অনীশ বললো, তিনখানা কার্ড? টিনা তো এখানে থাকে না।

সেলিম চমকে উঠলো। শিখার মুখের দিকে তাকাতেই শিখা বললো, ও অনেকদিন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গেছে। তুমি জানতে না?

সেলিম জিজ্ঞেস করলো, কোথায় থাকে?

অনীশ বললো, ওর ইউনিভার্সিটির কাছেই। ঠিক আছে, সেলিম, তুমি পরে আর একদিন এসো। থ্যাঙ্কস এনিওয়ে, ফর দা গিফ্‌ট্‌স!

সেলিম বুঝতে পারলো, অনীশ টিনার ঠিকানাটা তাকে জানাতে চায় না।

gronthagar.weebly.com

শিখা বললো, আর একদিন ঠিক এসো। ফোন করে এসো!

সেলিম একবার ভাবলো, তার দোকানের ফোন নাম্বারটা ওদের কাছে দিয়ে যাবে কি না। কিন্তু ওরা কোনো আগ্রহ দেখালো না, তা হলে আর দিয়ে কী হবে!

রাস্তায় বেরিয়ে সেলিম খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। জীবনময় স্যার তাকে নিয়ে এসেছিলেন, এই বাড়িতে সেলিম প্রথম আশ্রয় পেয়েছিল। এ বাড়ির স্মৃতি সে কখনো ভুলবে না। কিন্তু আজ যেন এদের দু'জনেরই ব্যবহার কীরকম আড়ষ্ট। কোনো উত্তাপ ছিল না। এ বাড়িতে সে আর নিজের থেকে কোনোদিন আসতে যাবে কেন?

শিখা ভাবী তাকে অনেকগুলি ডলার দিয়েছিলেন। কোনো না কোনো সময় সেলিম তা শোধ করে দেবে।

সেলিমের মূকাভিনয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বেশ বড় করেই করা হয়েছে। ভাড়া নেওয়া হয়েছে একটা চার্চের হল। যেহেতু কোনো ভাষার ব্যাপার নেই, মূকাভিনয় সবাই বুঝতে পারবে, তাই শুধু 'ঐকতান' ক্লাবের সদস্যদের মধ্যেই নয়, বাইরেও টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। বীথি, ইউসুফরা প্রবল উৎসাহে অনেকগুলো পোস্টার হাতে

এঁকে লাগিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ছাত্রদের সংবাদপত্রে সেলিমের ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে ছবিসমেত।

রাতের পর রাত জেগে সেলিম প্র্যাকটিস করেছে পাগলের মতন। ঘড়ি ধরে মিলিয়েছে এক একটি আইটেম। বীথি আর একটি মেয়েকে তৈরি করেছে, তারা মঞ্চে এসে প্রতিটি আইটেমের নাম দেখিয়ে যাবে। আমেরিকান মেয়েদের মতন ছোট ফ্রক পরতে তারা রাজি নয়, শাড়িই পরবে, কিন্তু মঞ্চে হাঁটার কায়দাটাও তো শেখা চাই।

মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে সেলিম, মনসুর সাহেব তাকে উৎসাহ দিয়েছেন। বদলি একজন লোক দিয়ে দোকান থেকে দু'দিনের ছুটিও পেয়েছে সে। মনসুর সাহেবের বাড়ির সবাই দেখতে আসবেন, জুলেখা ছাড়া। এর মধ্যে জুলেখা আবার নিরুদ্দেশ। জসিমচাচা তা হলে মিথ্যে কথা বলেন না।

শনিবার অনুষ্ঠান শুরু রাত আটটায়, এখানে সেটাই নিয়ম, লোকে ডিনার খেয়ে এসব দেখতে আসে। সেলিম বিকেল পাঁচটা থেকে গ্রীনরুমে বসে রইলো। বিভিন্ন আইটেমের জন্য মেক আপ বদল করতে হয়। সব সরঞ্জাম পরপর সাজিয়ে রাখতে হয়, একেবারে সময় পাওয়া যায় না। দু'একটা নতুন আইটেম সে তৈরি করেছে। তার মধ্যে একটা হলো, বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের দৃশ্য। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, আমলা, সাধারণ মানুষ, মায়ের কোলে শিশু—একসঙ্গে সাত-আটটি চরিত্র সে দেখাবে, খুবই শক্ত।

gronthagar.weebly.com

পৌনে আটটা যখন বাজে, হলে দর্শক এসে গেছে অনেক, বেজে গেছে ফার্স্ট বেল, হঠাৎ সেলিম অনুভব করলো, তার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। কপাল সাংঘাতিক গরম, জ্বালা করছে চোখ। তার প্রবল জ্বর এসে গেছে! তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেল সে, মুখ পেইন্ট করা, জল ছেটাবার উপায় নেই, সেলিম খানিকটা বমি করলো। তার সারা শরীর কাঁপছে।

আজ শো ক্যানসেল করে দাও, আমি আজ পারবো না!

বীথি বললো, পাগল নাকি? কী হয়েছে আপনার? এখন শো ক্যানসেল করা যায়? কত দূর দূর থেকে লোকে দেখতে এসেছে জানেন? তিনটে কাগজের রিপোর্টার এসেছে।

সেলিম কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমি অসুস্থ ভীষণ অসুস্থ, আজ পারবো না!

বীথি পাত্তা না দিয়ে বললো, ও ঠিক হয়ে যাবে। এক ঢোক চা খেয়ে নিন। সেকেন্ড বেল পড়ে গেছে।

সেলিমের অবস্থাটা কেউ বুঝলো না। 'ঐকতান' ক্লাবের সদস্যদের মান সম্মানের ব্যাপার আছে, এখন অনুষ্ঠান বাতিল করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। থার্ড বেল শেষ হতেই রেকর্ডে বেজে উঠলো কনসার্ট, বীথি আর শাকিলা পোস্টার নিয়ে ঢুকে গেল মঞ্চে। দু'জনেই জামদানি শাড়িতে দারুণ সেজেছে। নাচের ভঙ্গিতে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে তারা ফিরে আসার পরই ইউসুফরা কয়েকজন মিলে জোর করে সেলিমকে ভেতরে ঠেলে দিল।

মুখে সাদা রং করা, তাই সেলিমের বিবর্ণতা বোঝা যায় না। মঞ্চের মাঝখানে সেলিমের ওপর ফোকাস, তাতেও বোঝা যায় তার সারা শরীর কাঁপছে, দর্শকরা ধরে নিল, সেটাই তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সেলিমের কিছুই মনে পড়ছে না, মাথা ঘুরছে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে!

হঠাৎ সেলিম দেখলো, ঠিক তার সামনে, দর্শকদের মধ্যে তৃতীয় রো'র ঠিক মাঝখানে বসে আছে টিনা। ব্যগ্রভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। একবার সেলিম ভাবলো, তার চোখের ভুল। টিনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নয়, সেলিমের সঙ্গে তার দেখা হয়নি, সে কী করে আসবে? কেন আসবে?

চক্ষু বুজে আবার চোখ খুললো সেলিম। হ্যাঁ, টিনাই তো, আর কেউ নয়। সাধারণত সে শাড়ি পরে না, আজ একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরে বিশেষভাবে সেজে এসেছে, হাসিমুখে তাকে দেখছে!

সেলিমের যেন সারা শরীরের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল মাথা। সে মূর্তির মতন স্থাণু হয়ে ছিল, এবার প্রথম পদক্ষেপ ফেললো। তার সব মনে পড়ে গেছে!

অনুষ্ঠান করতে করতে বারবার সে তাকাচ্ছে অডিটোরিয়ামে। আশ্চর্য ব্যাপার, আর একজনও নারী-পুরুষকে সে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু টিনা, আর কেউ নেই, শুধু সেই একজনকেই সব কিছু দেখছে

granthagar.weebly.com

সেলিম।

প্রথম আইটেম শেষ হবার পর প্রচুর হাততালি পড়লো। সেলিম ভেতরে আসতেই ইউসুফরা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, দারুণ হয়েছে! খুব জমে গেছে। তুমি শুধু শুধু আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, সেলিমভাই!

সেলিম কোনো কথা বলছে না। এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যিই টিনা এসেছে? টিনাকে একদিন সে অপমান করেছিল, দেখেও কথা বলেনি, তবু সে নিজে থেকে তার অনুষ্ঠান দেখতে আসবে?

পরের বার মঞ্চে প্রবেশ করে সেলিম আবার দেখলো, ঠিক এক জায়গায় বসে আছে টিনা। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে ঠোঁট টিপে হাসলো। এবারেও তার মনে হলো, অডিটোরিয়ামে আর কেউ নেই, শুধু একা ওই এক যুবতী, ঝকঝক করছে তার চোখ দু'টি।

অনুষ্ঠান এক ঘন্টা দশ মিনিটের, শেষ হলো কাঁটায় কাঁটায়। দর্শকরা স্ট্যান্ডিং ওভেশান দিল তাকে, হাততালি আর শেষই হয় না। এই প্রথম সেলিম টের পেল যে, হলের সব সীটই প্রায় ভর্তি ছিল, প্রচুর অচেনা মুখ, এখন এত মানুষের ভিড়ে বরং টিনাকে আর দেখা গেল না।

granthagar.weebly.com

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা দারুণ খুশি। সেলিম তাদের নতুন ধরনের একটা অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। মূকাভিনয় এখানে আর কখনো হয়নি। গ্রীনরুমে প্রচুর ভিড় হয়ে গেল, নানা জনের নানা প্রশ্ন। সেলিমের সারা শরীরে সার্থকতার শিহরন। এ দেশে আসার পর এই প্রথম সে অন্যদের চোখে বিশিষ্ট হলো।

মেক আপ তুলতে তুলতে হঠাৎ তার খেয়াল হলো, টিনা তো গ্রীনরুমে এলো না! সে যেন ধরেই নিয়েছিল, টিনা ভেতরে একবার আসবে। চেনাশুনোরা মুখোমুখি প্রশংসা শুনিয়ে যায়, সেটাই তো প্রথা।

টিনা আসবে না?

একবার সে একজনকে বলতে গেল, টিনাকে ডেকে আনো তো!

পরক্ষণেই মনে পড়লো, এখানে তো টিনাকে আর কেউ চেনে না।

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হল এখন ফাঁকা। দর্শকরা অনেকেই গাড়িতে উঠে গেছে, কিছু কিছু হাঁটছে, কয়েকজন বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

সেলিম ইতিইতি খুঁজতে লাগলো। টিনা গাড়িতে এসেছে, না

বাসে ? অন্য কেউ সঙ্গে ছিল ? যে সব গাড়ি এখনো ছাড়েনি, তার কোনোটাতেই টিনা নেই। যারা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে আছে ?

সেলিম চিৎকার করে ডেকে উঠলো, টিনা ! টিনা !

তারপর মুখে অর্ধেক রং মাখা অবস্থায় সে দৌড়োতে লাগলো রাস্তা দিয়ে।

॥ ১০ ॥

ছোট নদীটা কয়েকদিন আগেও ছিল আইসক্রিমের নদী, এখন আবার আগের চেহারা ফিরে এসেছে। এখানকার নদীর জল স্বচ্ছ নয়, কালচে ধরনের। এখানে সবাই সাঁতার কাটে সুইমিং পুলে, যেখানকার জল নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়, শখ করে কেউ নদীতে নামে না। এখানকার নদীতে অনেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরে বটে, সেও শুধু মাছ ধরার নেশায়, সেই মাছ কেউ খায় না। ধরার পর আবার ছেড়ে দেয়। মাছগুলি দূষিত। সব নদীর জলই কলকারখানার গাদে নোংরা।

তবু নদীটা দৃশ্যত সুন্দর। কিছুদূর অন্তর অন্তর এক একটা সেতু, দুপাশে একটানা বাগান। বসন্তকালে অনেকেই অন্য রাস্তা ছেড়ে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যায়। অনেক ছেলেমেয়ে গাছতলায় বসে রোদ পোহায়। বসন্ত এসেছে, এখন বেশিক্ষণ কেউ আর ঘরে থাকতে চায় না।

ক্লাস শেষ হবার পর ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো টিনা। জিনস্-এর ওপর একটা টকটকে লাল রঙের সোয়েটার পরা। গাড়ি আনেনি আজ, হেঁটেই ফিরবে। এ সময় তার বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে না, লাইব্রেরিতে অনেকটা সময় কাটায়। কিন্তু আজ সন্ধেবেলা দিদির বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে, দেশ থেকে একজন গায়িকা এসেছেন। দেশ থেকে নাম করা কেউ এলে শিখার বাড়িতে একটা পার্টি হবেই।

অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে এসে টিনা দেখলো, খেলার মাঠের পাশে একটা বড় মেপ্‌ল গাছের নীচে একটা সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেলিম।

স্যালভেশন আর্মির দোকান থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড নীল রঙের সুট কিনেছে সেলিম, লম্বা, মেদহীন চেহারা, এই পোশাকে সে একজন দর্শনীয় সুপুরুষ। মুখ-চোখ থেকে ভয় ও অস্বস্তি কেটে গিয়ে ফিরে

এসেছে আত্মবিশ্বাস। বোঝা যায়, সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। টিনাকে দেখে সে হাতের সিগারেট ফেলে দিল।

কাছে এসে, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে টিনা বলল, কী খবর? একেবারে সাহেবের মতন দেখাচ্ছে যে!

সেলিম বললো তোমাদের ম্যাস কমিউনিকেশানের ক্লাস হয় দু'জায়গায়। কোথায় তোমাকে পাবো, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

টিনা বললো, সাইকেলে এসেছো? এখনো গাড়ি কেনোনি?

সেলিম বললেন, প্রায় কিনতে যাচ্ছিলাম, বেশ শস্তায় একটা টয়োটা পেতে পারতাম। কিন্তু একজন বললো, ড্রাইভিং লাইসেন্স করাতে গেলে বিপদে পড়ে যাবো। আমার তো এখনো টুরিস্ট ভিসা!

টিনা বললো, এখনো ভিসা ঠিক করোনি, চাকরি করছো? কোন্ দিন ধরা পড়ে যাবে, দেবে দেশে পাঠিয়ে!

সেলিম বললো, শিগ্‌গিরই ঠিক হয়ে যাবে, আমার বস্ কথা দিয়েছে।

টিনা বললো, বাঃ, ভালো কথা!

দু'জনে হাঁটতে লাগলো সামনের দিকে।

সেলিম আশা করেছিল, তাকে দেখামাত্র টিনা তার সেদিনের অনুষ্ঠানের কথা তুলবে। আগাগোড়া বসে থেকে দেখেছে, মাঝপথে উঠে যায়নি, নিশ্চয়ই তার ভালো লেগেছে। যে শিল্পী, সে অন্য সব কথা বাদ দিয়ে নিজের শিল্পের কথাই শুনতে চায়।

টিনার কাছে সে কৃতজ্ঞ। সেদিন শেষ মুহূর্তে এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, কিছুতেই অনুষ্ঠান করতে পারতো না, টিনাকে দেখে তার মনের জোর ফিরে পেয়েছিল হঠাৎ। এগুলো কী করে হয়, কে জানে! টিনাকে দেখেই তার সব ভয়, স্টেজ ফ্রাইট কেটে গেল কীভাবে? টিনা তার কে?

টিনা কি সত্যি গিয়েছিল? না, পুরোটাই সেলিম কল্পনা করেছে? দর্শকদের মাঝখানে টিনার চেহারাটা কল্পনা করে সে অনুষ্ঠান চালিয়ে গেছে? শেষকালে টিনার সঙ্গে দেখা হলো না কেন?

রাস্তার ধারে একটা স্টলের সামনে বেশ ভিড়। গরম গরম হট ডগ আর কফি বিক্রি হচ্ছে।

টিনা বললো, আমার একটু খিদে পেয়েছে। হট ডগ খাবে?

সেলিম বললো, তুমি দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।

সেলিম গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো। এক জোড়া তরুণ-তরুণী

দোকানটা চালাচ্ছে, মনে হয় ওরা মেক্সিকান।

কাউন্টারের কাছে পৌঁছে সেলিম নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, বীফ না পর্ক ?

মেক্সিকান মেয়েটি বললো, বীফ, বীফ !

লম্বা রুটির টুকরোর মধ্যে রাই আর কেচআপ মাখানো হট ডগ নিয়ে এসে সেলিম জিজ্ঞেস করলো, কফিটা এক্ষুনি আনবো, না পরে ?

টিনা বললো, থ্যাঙ্কস ! তোমরা এদেশে এসেও পর্ক খাও না, তাই না ?

সেলিম বললো, শুয়োরের মাংস... নোংরা হয়... হুক ওয়ার্ম থাকে। টিনা তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠলো।

সেলিম একটু থতোমতো খেয়ে গেল।

টিনা বললো, আমেরিকানদের দারুণ স্বাস্থ্যবাতিক ! নোংরা মাংস হলে ওরা খেত ? তোমাদের সংস্কার আছে, তা স্বীকার করো না কেন ?

সেলিম খানিকটা দমে গেল। এই ধরনের কথা শুনবে ভেবে সে টিনার কাছে আসে নি। সে অনেকখানি প্রত্যাশা নিয়ে টিনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল আজ।

granthagar.weebly.com

খাবারটা শেষ করার পর টিনা বললো, দাঁড়াও, কফির দাম আমি দেবো।

সেলিমের বাধা উপেক্ষা করে টিনা নিয়ে এলো কফি। সেলিম আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না, সে নিঃশব্দে চুমুক দিচ্ছে।

টিনাই অপ্রত্যাশিত ভাবে বললো, সেদিন তোমার অনুষ্ঠান তো বেশ জমে গিয়েছিল !

সেলিম উদ্ভাসিত মুখে বললো, তুমি গিয়েছিলে ?

—বাঃ, যাইনি ? কেন, তুমি আমায় দেখতে পাওনি ?

—হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু শো শেষ হবার পর...

—আমার ফেরার তাড়া ছিল।

—তুমি নিজে নিজেই আমার অনুষ্ঠান দেখতে গেলে ?

—বাঃ, তুমি দিদির বাড়িতে আমার নামে কার্ড রেখে গিয়েছিলে !

—তা রেখে এসেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা, তুমি আমার ওপর রাগ করে আছো।

—কেন ?

—আগ্রা হোটেলে... তোমাকে দেখেও আমি সামনে আসিনি,

তোমার সঙ্গে কথা বলিনি...

টিনা আবার সরলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলো।

হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, সেদিন তুমি খুব বোকার মতন ব্যবহার করেছিলে... টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান, স্যরি বাংলাদেশী... রেস্তোরাঁয় বেয়ারার কাজ করছিলে, তাতে লজ্জার কী আছে? আমি কি তোমাকে আগে থেকে চিনি না? তুমি একজন আর্টিস্ট...

—টিনা, তুমি সেদিন আমার অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলে, সেজন্য সত্যি আমি খুব কৃতজ্ঞ।

—এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার কী আছে?

—না, মানে, আমি নিজে তোমাকে ইনভাইট করিনি, তার আগে আগ্রা হোটেলে ঐ রকম ব্যবহার করেছি, তবু তুমি গিয়েছিলে... আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না তার জন্য আমি...

—তুমি ভুলে যাচ্ছো, সেলিম, আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাস কমিউনিকেশান, তুমি এ দেশে একজন আননোন আইডেনটিটি... তোমার অনুষ্ঠান এখানকার ছেলে-মেয়েরা কতটা উপভোগ করবে, সেটা দেখার একটা কৌতূহল ছিল।

—শুধু সেই কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিলে?

granthagar.weebly.com

টিনা আবার খুব জোর হেসে উঠলো।

এবার আর হাসির কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। কফির কাগজের কাপটা কাছাকাছি একটা ট্রাসক্যানে ফেলে দিয়ে বললো, ঠিক আছে, আজ চলি।

সেলিম বললো, টিনা, তুমি এখন আলাদা থাকো শুনেছি।

টিনা বললো, হ্যাঁ, বেশ কাছেই। কিন্তু সেখানে তোমাকে আজ ইনভাইট করতে পারছি না, আমাকে একটু বাদেই বেরুতে হবে!

টিনা আর দাঁড়ালো না, চট করে চলে গেল রাস্তা পেরিয়ে।

সেলিম তবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। টিনা তার বাড়ির ঠিকানা কিংবা ফোন নাম্বার কিছুই না দিয়ে চলে গেল। এ দেশে সবাই ফোন নাম্বার বিনিময় করে। টিনা কি তাকে এড়িয়ে যেতে চায়? তা হলে নিজে থেকে তার অনুষ্ঠান দেখতে গেল কেন? টিনাকে যে তার খুব দরকার। ডিক্লব শহরে তার আর একটা অনুষ্ঠানের কথা হচ্ছে।

দু'দিন পর সেলিম আবার এলো। ওদের ডিপার্টমেন্টে ফোন করতেই টিনার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। সেলিম রাত আটটার আগে অন্যদিন ছুটি পায় না। তখনই সে ঐ নম্বরে

ফোন করেছিল। বাড়িতে কেউ নেই। আনসারিং মেশিন জানিয়েছে যে টিনা দত্ত ফিরবে রাত সাড়ে নটায়।

ঠিক সেই সময় এসে টিনার অ্যাপার্টমেন্টে বেল দিল সেলিম।

টিনা তার মিনিট পাঁচেক আগেই ফিরেছে। বাইরের পোশাক ছেড়ে সে পরে নিয়েছে রাত পোশাক। তার আজ মেজাজ ভালো নেই। তার চীনে বন্ধু লী আজ তাকে বাইরে ডিনার খেতে ডেকেছিল। লী কখনো বাড়ির বাইরে বেশি রাত করে না। এদেশী শ্বেতাঙ্গ গৃহস্থের মতন সে সন্ধে সাতটায় ডিনার খেয়ে নেয়। সে মদ্যপানের নেশাও করে না, সুতরাং দেরি হবার কোনো কারণও নেই। কিন্তু টিনার আজ প্রথমেই একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল। লী'র সঙ্গে কিম নামে একজন বন্ধুকে দেখে। বান্ধবীকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে সঙ্গে একটি ছেলে বন্ধুকে আনা আবার কী ধরনের চীনে কায়দা! কিম ছেলেটি প্রগল্ভ ধরনের। এক একজন থাকে, অন্যদের কথা বলার সুযোগ দেয় না। নিজেই শুধু হাসি-ঠাট্টা, মজার কথা সব বলে। শুধু তাই নয়, কিম মাঝে মাঝেই টিনার প্রতি সূক্ষ্ম যৌন-ইঙ্গিত দিচ্ছিল, যা লী হয়তো বোঝেনি, টিনা ঠিকই বুঝেছে। রীতিমত অপমানিত বোধ করেছে টিনা। এই ধরনের বন্ধুকে এনে আজ তার সন্ধেটাই বিস্বাদ করে দিয়েছে লী।

gronthagar.weebly.com

ম্যাজিক আই-তে সেলিমকে দেখে টিনার ভুরু কুঁচকে গেল। এই সময় সেলিম কি চায়? বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে হুট করে বাড়িতে চলে এসেছে!

সঙ্গীতা নিউ ইয়র্ক বেড়াতে গেছে। আরও দু'দিন সে থাকবে না। অ্যাপার্টমেন্টে টিনা একা। এই অবস্থায় কোনো অতিথিকেই সে ভেতরে আসতে দেয় না। টিনা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। কোনো সাড়াশব্দ না করে, দরজা না খুললেই চুকে যায়। সেলিম কয়েকবার বেল দিয়ে ফিরে যাবে।

কিন্তু রাস্তার দিকের জানলা দিয়ে ঘরে আলো জ্বলছে কিনা দেখা যায়। কয়েকবার বেল দিয়েও দরজা না খুললে এদেশের লোকেরা বুঝতে পারে। কিন্তু সেলিম কি তা বুঝবে?

টিনা দরজা খুললো, পুরোটা নয়, সেই জুড়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, সেলিম?

টিনা যে তাকে ভেতরে আসতে বলবে না, এটা সেলিম কল্পনাই করতে পারে না। নিজে থেকে সেদিন টিনা তার অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল, সর্বক্ষণ বসে ছিল, অতটা আগ্রহ দেখিয়েছে, সেই টিনা

তাকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেবে, তা কি হতে পারে ?

সে হেসে, রসিকতার ভঙ্গিতে বললো, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই চলে এলাম। দ্যাখো, তোমার বাড়িটা ঠিক খুঁজে বার করেছি !

এ কথায় মোটেই খুশি হলো না টিনা। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তার মনে হলো, সেলিমের এই ব্যবহার শিশুসুলভ !

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে টিনা বললো, আমাকে দেখতে ইচ্ছে হলো ! হাউ ইন্টেরেস্টিং ! দেখা হলো তো ? এখন আমি.....

প্রথম বাক্যটা বলেই সেলিম বুঝতে পেরেছে যে তার ভুল হয়েছে। ঠিক মনের কথাটা সব সময় মুখে বলা যায় না। সব কিছুর জন্যই প্রস্তুতি লাগে।

সেলিম বললো, তোমাকে ফোন করেছিলাম, তুমি ছিলে না। তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা দরকার আছে।

ভুরু তুলে টিনা বললো, আমার সঙ্গে দরকার ? ঠিক বুঝতে পারছি না। সেলিম, এই সময় আমি পড়াশুনো করি।

সেলিম খুবই অনুনয়ের সুরে বললো, বেশিক্ষণ বসবো না। বড় জোর দশ মিনিট। সত্যি একটা কাজের কথা আছে।

granthagar.weebly.com

টিনা একটুক্ষণ দ্বিধা করলো। সেলিম বলছে, বসবো না। ওকে বসতে বলা হবে, ধরেই নিয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার ইঙ্গিতটা বুঝবে না !

সরে দাঁড়িয়ে টিনা বললো, ভেতরে এসো !

সেলিম ঢুকে, চারদিকে তাকিয়ে বললো, বেশ বড় অ্যাপার্টমেন্ট তো তোমার। আমি যেটা নিয়েছি, বেশ ছোট।

তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে একটা প্যাকেট বার করে বললো, নতুন গুড়ের সন্দেশ। দেশ থেকে এসেছে।

—দেশ থেকে তোমাকে কেউ পাঠিয়েছে ?

—না, আমাকে কে পাঠাবে ? আমি তো কারুর সঙ্গে যোগাযোগই রাখিনি। আমাদের দোকানে এসেছে।

—ভালো কথা। আমি মিষ্টি খাই না।

—খুব ভালো সন্দেশ। তোমার জন্যই এনেছি, টিনা।

—বললাম যে আমি মিষ্টি খাই না। তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, সেলিম। এসব গিফ্‌ট আনবার কী দরকার ? দিদির বাড়িতেও তুমি অনেক জিনিস দিয়ে এসেছো, শুনেছি।

—সামান্য একটু কিছু। তুমি একটাও খাবে না ?

—ঠিক আছে, তোমার কথায় একটা খাচ্ছি। বাকিটা নিয়ে যাও। আমার রুমমেট মিষ্টি একেবারে ছোঁয় না। আর কে খাবে ! এবার বলো তো কাজের কথাটা !

—তুমি ডিকল্ব জায়গাটা চেনো ?

—নাম শুনেছি। এখান থেকে বেশ দূর।

—সেখানে আমার একটা অনুষ্ঠান আছে, এই উইক এন্ডে। তুমি সেখানে আমার সঙ্গে যাবে, প্লিজ ?

টিনা ফ্রিজ থেকে একটা জলের বোতল বার করছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি তোমার সঙ্গে ডিকল্ব যাবো ? কেন ?

সেলিম বললো, ওই বললাম, আমার একটা অনুষ্ঠান আছে।

—তোমার অনুষ্ঠান আছে বলে আমাকে যেতে হবে ?

—তুমি গেলে আমি অনেকটা ভরসা পাবো। আমার খুব নার্ভাস লাগে।

—হোয়াট আ ফানি রিকোয়েস্ট ! তোমার নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য আমাকে ট্যাং ট্যাং করে অত দূরে যেতে হবে। আমার ক্লাস-টলাস নেই ?

gronthagar.weebly.com

—উইক এন্ডের ছুটি আছে।

—আমার উইক এন্ডেও কাজ থাকে। প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। সরি, সেলিম, তোমার এই ধরনের অদ্ভুত অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না !

—তুমি আমাকে পছন্দ করো না, টিনা ?

—আর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। পছন্দ করবো না কেন ? তোমাকে অপছন্দ করার মতন কিছু ব্যবহার পেয়েছো ? বাস্টিডে তোমার অনুষ্ঠান আমি দেখতে যাইনি নিজেই ?

সেলিম সোফায় বসেছিল, উঠে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করে হঠাৎ দ্রুত টিনার কাছে এসে তার একটা হাত ধরে আপ্লুত গলায় বললো, টিনা, তুমি জানো না, আমার জীবনে তোমার ভূমিকা কতখানি। এদেশে এসে প্রথম তোমার সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে, সেদিন আমার অনুষ্ঠানের আগে এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম, শুধু তোমাকে দেখে....তুমি যদি আমার পাশে পাশে থাকো....তোমাকে প্রত্যেকবার যেতে হবে না। এবারে অন্তত ডিকল্বে তুমি আমার সঙ্গে চলো, প্লিজ চলো। প্লিজ, না বলতে পারবে না।

এক ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল টিনা। বেশ কয়েক

মুহূর্ত সোজা তাকিয়ে রইলো সেলিমের মুখের দিকে। তার চোখে ঝলকাচ্ছে আগুন। সন্ধের পর থেকেই তার মেজাজ খিঁচড়ে আছে, এখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, প্লিজ গো—

বুঝতেই পারছে না সেলিম। এখনো তার সারা শরীরময় আবেগ। সে এত করে চাইছে টিনাকে, তবু টিনা না বলবে কী করে?

—সেলিম, প্লিজ গো!

—তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো?

—আর কত স্পষ্ট ভাষায় বলবো? আমি এখন ব্যস্ত আছি। তোমার ওই ধরনের কথা শোনার সময় নেই।

—তুমি, তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো? তোমাকে একটা অনুরোধ করলাম—

—তোমরা সবাই অদ্ভুত! তোমাদের সঙ্গে একটু বন্ধুত্বের ভাব দেখালেই তোমরা ভাবো, অমনি বুঝি মেয়েরা প্রেমে পড়ে গেছে! তুমি আমাকে উইক এন্ডে এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছো, হাউ ডেয়ার ইউ! আই অ্যাম নট ইওর গার্ল ফ্রেন্ড!

granthagar.weebly.com

সেলিমের মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে কোনো কথাই বলতে পারলো না।

টিনার মেজাজ এত চড়ে গেছে যে সে আর থামতেই পারছে না। কাঁপছে তার শরীর। জিভে অনেকখানি বিষ মিশিয়ে সে আবার বললো, তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাত আছে। আমি এদেশে চাকরির ধান্দায় আসিনি। যে কোনো ছলছুতোয় এদেশে থেকে যাবার কোনো চেষ্টা আমার নেই। আমি পড়াশুনো করতে এসেছি। রীতিমতন স্কলারশিপ নিয়ে এসেছি, কারুর দয়ার ওপর নির্ভর করি না। পড়াশুনো করাটাই আমার আসল কাজ। এইসব ন্যাকামি করার কোনো সময় আমার নেই।

সেলিম অস্ফুট স্বরে বললো, তুমি, তুমি আমাদের সঙ্গে মেশার যোগ্য মনে করো না! আমি ছোট চাকরি করি।

—মোটেই সে-কথা বলিনি! সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে তো আমার কোনো আপত্তি নেই। বন্ধুত্ব মানেই কি ওইসব ন্যাকামি করতে হবে? তুমি যখন তখন আমার হাত ধরো কেন? আরও একদিন, দিদিদের বাড়িতে, আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলেছিলে, আই লাভ ইউ! তোমরা একটা সীমারেখা রাখতে জানো

না ? সেদিনই আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে অপমান করতে পারতাম, নেহ্যত তোমার কোনো চালচুলো ছিল না।

সেলিমের গায়ে যেন অসংখ্য বিষের তীর বিঁধছে। সে আর সহ্য করতে পারছে না। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে সে কোনোরকমে বললো, তুমি আমাকে এতখানি অপছন্দ করো, আমি জানতাম না, আমার ভুল হয়েছে, আর কোনোদিন আসবো না। আর কোনোদিন তুমি আমার মুখ দেখতে পাবে না। কেনোদিন, কোনোদিন, কোনোদিন না ! এই শেষ !

দরজা খুলে, সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম করে নেমে গেল সেলিম। সাইকেলে চেপে চালাতে লাগলো অন্ধের মতন। যে-কেউ দেখলে মনে করবে সে বদ্ধ মাতাল। রাস্তা ছেড়ে একবার সে প্রায় হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছিল নদীতে। অতিকষ্টে সামলে নিলেও তারপর তার দিক ভুল হয়ে গেল। হাইওয়ে ধরে দশ-মাইল, পনেরো-মাইল সাইকেল ছোটাচ্ছে সেলিম, হঠাৎ এক এক জায়গায় বাঁক নিচ্ছে, সে কোথায় যাবে তারই যেন ঠিক-ঠিকানা নেই। বিড়বিড় করে অনবরত বলছে, আর কোনোদিন না, কোনোদিন কোনোদিন সে আর টিনাকে তার মুখ দেখাবে না ! সে মূকাভিনয় অনুষ্ঠান করাও ছেড়ে দেবে। তার কিছু চাই না। কিছু না !

gronthagar.weebly.com

শেষ রাতে মোটামুটি অক্ষত অবস্থাতেই নিজের ডেরায় ফিরে এলো সেলিম।

ডিকল্ব-এর অনুষ্ঠানেও তাকে যেতে হলো। টিনার সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু টিনার মুখ তার সঙ্গ ছাড়লো না। মনে মনে সে সব সময় টিনার সঙ্গে রাগ, তর্ক, ঝগড়া করে চলেছে। এমনকি, মঞ্চে আসামাত্র তার মনে হলো, দর্শকদের মাঝখানে বসে আছে টিনা। এটা হতেই পারে না। তার চোখের ভুল, সেলিম জানে যে টিনা আসতেই পারে না, তবু সে ভুল দেখছে। একটা আইটেমের পর ফিরে এসে আবার দেখছে। না, টিনা নয়, অন্য একটি পাকিস্তানী মেয়ে, শালোয়ার-কামিজ পরা, মাথার কিছুটা ওড়নায় ঢাকা, বয়েস বেশি, তবু সেই মেয়েটি মাঝে মাঝে টিনা হয়ে যাচ্ছে। গোটা অনুষ্ঠানটা সে টিনার কথাই ভেবে গেল।

দোকানে অন্য লোকজনের সঙ্গে সময় কেটে যায়, কিন্তু নিজের ঘরখানায় যখনই সে একা থাকে, তখনই ফিরে আসে টিনা। সেলিমের পৌরুষে একটা সাঙ্ঘাতিক ঘা লেগেছে, সে নিজে থেকে

যে কোনো মেয়ের কাছে ছুটে যায় না, একমাত্র টিনার সাহচর্য চেয়েছিল, সেই টিনা তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিল। কী আছে মেয়েটার ? ভারী লেখাপড়ার গর্ব করে, ওর চেয়েও অনেক ব্রিলিয়ান্ট বাংলাদেশী ছাত্রী আছে এদেশে। দেখতেও এমন কিছু হুরী-পরী নয় ! সেলিম ওকে মন থেকে মুছে ফেলবে !

তবু, সেলিমের ঘরে ফোন বেজে উঠলেই সে ভাবে, টিনার ফোন ! যদিও টিনা তার ফোন নাম্বার জানেই না। ইচ্ছে করলেই এদেশে ফোন নাম্বার জানা যায়, টিনা সেরকম কোনো চেষ্টাই করেনি। ও মেয়ের ভারী অহংকার। থাক ওর নিজের অহংকার নিয়ে। সেলিম ওকে কখনো ফোনও করবে না। এক এক সময় ফোনে খুব গালাগালি করতে ইচ্ছে হয়, তাও করে না।

একদিন রাত দশটায় সেলিমের ঘরে কে বেল দিল। দরজা খুলেই ধক করে উঠলো সেলিমের বুক। টিনা এসেছে ! সত্যি এসেছে !

টিনা নয়, অন্য একটি মেয়ে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মুখ, তবু সেলিম টিনার কথাই ভাবছে।

মেয়েটি ঝকঝকে ভাবে হেসে বললো, হাই হ্যান্ডসাম ! তোমার হাইড আউট দেখতে এলাম।

gronthagar.weebly.com

সেলিমকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে এলো জুলি। আজ রাতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, জুলির গায়ে একটা হলুদ রেনকোট। সেটা খুলে ঘরের একটিমাত্র চেয়ারের ওপর ছুড়ে দিল। একচিলতে ঘর, তাতে আর একটি খাট ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই। টাইট পোশাক পরা জুলি সেই খাটের ওপর বসে পড়ে বললো, তুমি তোমার ঘরে কেন আমাকে আগে ইনভাইট করোনি !

এর মধ্যে দুটি ছেলের সঙ্গে নেভাডা চলে গিয়েছিল জুলি। পড়াশুনোয় তার মন নেই, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে যেখানে সেখানে চলে যেতে তার ভালো লাগে। তাকে শাসন করতে পারে না কেউ। সেলিম অন্য দু'একজনের মুখে মাঝে মাঝেই শোনে যে মনসুর আলির ইচ্ছে তার এই মেয়েটির সঙ্গে সেলিমের বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সে কথা তিনি সেলিমকে নিজে কখনো বলেননি।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেলিম। জুলিকে সে ফিরিয়ে দেবে কী করে ? জুলি যদি রেগে যায়, তা হলে সেলিমকে এই চাকরিটি হারাতে হবে !

ইরানী মায়ের কন্যাটির চোখে ছুরির ধার। কিন্তু ঠোঁটের রেখায় অদ্ভুত সারল্য। সে হাসতে হাসতে বললো, কী হলো তোমার,

সেলিম ? আমাকে দেখে ভয় পাওনি তো ? আমি তোমাকে খেয়ে ফেলবো না !

ভয় ভাঙাবার জন্য সে সেলিমের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিয়ে এলো নিজের পাশে। সেলিমের জামার বোতাম খুলে তার বুকে হাত বুলোতে লাগলো। তারপর সেলিমের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাকে দিল অমৃতের স্বাদ।

॥ ১১ ॥

ঐকতান ক্লাবের সদস্যরা এমন উৎসাহ দেখিয়েছিল, যেন অচিরেই সেলিমের নাম ছড়িয়ে পড়বে সারা আমেরিকায়। চতুর্দিক থেকে তার ডাক আসবে। এমনকি হলিউড থেকেও কন্ট্রাক্ট নিয়ে ছুটে আসবে কোনো প্রযোজক।

কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না।

মূকাভিনয়ের তেমন কদর নেই এদেশে। ক্যাম্পাস জার্নালে দু'একটা রিপোর্ট ছাপা হলো বটে, কিন্তু তাতে কে আর গুরুত্ব দেয়। কাছাকাছি শহরগুলির বাংলা ভাষা-ভাষী ছেলেমেয়েরাই তাকে ডাকতে লাগলো মাঝে মাঝে, তারা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, টিকিট বিক্রি হয় না, নিজেরাই চাঁদা তুলে কিছু ডলার তুলে দেয় সেলিমের হাতে।

ঢাকায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে ছাত্ররা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে-কোনো সরকারই ভয় পায়। ছাত্ররা খেপে গিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য মৌলবাদী শক্তিগুলো ছাত্রদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। টাকা-পয়সা ছড়িয়ে, অস্ত্র বিলিয়ে একদল ছাত্রকে উস্কে দেওয়া হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রায়ই দু'দল ছাত্রে মারামারি লাগে, গুলি-গোলা চলে।

এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড-আমেরিকার বাংলাদেশী ছাত্রদের মধ্যেও। প্রবাসে গেলেও দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে তারা মাঝে মাঝে সমাবেশ করে, দেখা যায় সেখানেও তাদের বিরোধীপক্ষ আছে। স্বৈরাচারের সমর্থনে তারা শ্লোগান দেয়। গণতন্ত্রের দাবিকে তারা বলে ভারতের দালালি ! বাংলাদেশ থেকে সামরিক শাসন সরিয়ে দেবার চেষ্টা আসলে ভারতেরই ষড়যন্ত্র !

সেলিম সামরিক শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র নিয়ে যে ক্যারিকেচারটি তৈরি করেছিল, সেটাই এখন বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। তাদের দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তির সঙ্গে ওই ক্যারিকেচারটা খুব জমে। প্রত্যেক সপ্তাহে সেলিমকে বিভিন্ন শহরে ওই অনুষ্ঠান করতে হয়।

এর মধ্যে সেলিম একদিন খবর পেল, তার বন্ধু মাহবুব উধাও হয়ে গেছে।

আগ্রা হোটেলের সহকর্মীদের সেই বেসমেন্টের ঘর ছেড়ে আসার পরেও মাহবুবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল সেলিম। চাকরি জীবনে মাহবুব তার প্রথম বন্ধু। রেস্তোরাঁর বেয়ারার কাজ করে, ড্রাগ চালান দেয়, তবু মাহবুব সাধারণ নয়, সে স্বপ্ন দেখে। সে টাকা জমিয়ে একদিন দেশে ফিরে যাবে, আবার একটা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করবে। যারা তার ভাইদের মেরেছে, যারা দায়ুদকান্দির ফেরিঘাটে তাকে অপমান করেছে, তাদের ওপর সে প্রতিশোধ নেবে।

সেই মাহবুবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে সেলিমের বুক কেঁপে ওঠে। বিপজ্জনক জীবন যাপন করছিল মাহবুব। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়। আবার ড্রাগের ব্যাপারে সামান্য এদিক ওদিক হলেও ড্রাগ লর্ডরা সাঙ্ঘাতিক প্রতিশোধ নেয়।

gronthagar.weebly.com

রাত্তিরবেলা সেই বেসমেন্টের ঘরে অন্যদের সঙ্গে দেখা করতে গেল সেলিম। আজ আর তাদের আসর বসেনি। সবাই মনমরা হয়ে আছে। জলিল নামে নতুন একটি ছেলে এসেছে, সে এখন সেলিমের জায়গাটায় শোয়।

গোটানো রয়েছে মাহবুবের বিছানা। ঘরের এক কোণে তার চটি, দড়ির ওপাশে ঝুলছে মাহবুবের দুটো শার্ট। মাহবুব দু'দিন ফেরেনি, রেস্তোরাঁতেও কোনো খবর দেয়নি।

আজিজুল বললো, এ দেশে সব জায়গায় টেলিফোন থাকে। খবর দেবার কোনো অসুবিধা নাই। দুইদিন যে মানুষ কোনো খবর দেয় না, সে কি বেঁচে থাকতে পারে?

সেলিম বললো, পুলিশে ধরা পড়লেও তো খবর পাওয়া যাবে। পুলিশ তো আর গুম করে দেবে না!

আজিজুল ভুরু ইঙ্গিত করে বললো, ওরা যদি ধরে? ওদের দু'তিনটা গ্যাং আছে। একদলের লোক অন্য দলের লোকদের সাফ করে দেয়।

মিন্টু বললো, তা হলেও লাশ কোথায় যাবে? আমার মনে হয়,

মাহবুবভাই এত সহজে মরবে না !

তা হলে সে কোথায় গেল !

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে যায় আবার।

মিন্টু একটা স্কচের বোতল বার করে একা একা পান করতে শুরু করে। তার সারা মুখে ঘামের বিন্দু। মাহবুবের ব্যাপারে সেই যেন সবচেয়ে বেশি বিচলিত।

আজিজুলও বোতলটা টেনে নিল নিজের কাছে।

হঠাৎ মিন্টু চেঁচিয়ে বলে উঠলো, আমি ঠিক বুঝেছি, মাহবুবভাই কোথায় গেছে। সে দেশে ফিরে গেছে !

আজিজুল বললো, যাঃ ! ওর সুটকেসটা রয়েছে, সব জিনিস পড়ে আছে এখানে।

মিন্টু বললো, ও সব কী ছাতার মাথা ! পাসপোর্ট তো সব সময় ওর নিজের কাছেই থাকে। ঢাকায় ছাত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, মাহবুবভাই তাতে জয়েন করতে গেছে।

আজিজুল বললো, তা হলে আমাদের বলে যাবে না কেন ?

মিন্টু বললো, বললেই আমরা বাধা দিতাম না ? বলতাম না, দেশে এখন অত গণ্ডগোল, যেও না, যেও না। আমরা শালা সব শুয়োরের বাচ্চা, নিন্‌কমপুপ ! এক দুই ডলার বখশিসের জন্য আমরা ঠেলাঠেলি করি। ডলারের ঝুনঝুনি আমাদের কানে বাজে। দেশে এখন আগুন জ্বলছে, ছাত্ররা মিলিটারির সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা এখানে বসে বুড়ো আঙুল চুষছি। আমরা শুয়োরের বাচ্চা, আমরা ফিরতে পারি না। মাহবুব ভাইয়ের গাট্‌স আছে, সে ফিরে গেছে !

—তুই কী করে জানলি ?

—গত শনিবার টেলিভিশনে দেখালো, ঢাকায় হাজার হাজার ছাত্র রাস্তার ওপরে বসে আছে। সেই দেখে মাহবুবভাইয়ের চোখমুখ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। রাগে ঠোঁট কাঁপছিল।

—মাহবুবের ওয়ার্ক পারমিট নেই, একবার গেলে আর আসতে পারবে না।

—থোড়াই কেয়ার করে সে ! ফেরার জন্য যায়নি। সবাই কি আমাদের মতন হিসেবি ! সে রিস্ক নিয়ে গেছে। দরকার হলে দেশের জন্য জান দেবে। সে আমাদের মতন শুয়োরের বাচ্চা নয় !

ফেরার পথে মিন্টুর কথাই সেলিমের মাথায় ঘুরতে লাগলো। মিন্টু যা বলছে, তা সত্যি হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে, মাহবুব যদি দেশে ফিরতে চায়, এরকমভাবে কারুকে কিছু না জানিয়ে যাওয়াই

granthagar.weebly.com

তার পক্ষে স্বাভাবিক। যাদের সঙ্গে সে ড্রাগের কাজ করতো, তারাও তাকে সহজে যেতে দিত না।

এ সময়ে কি সেলিমেরও ফিরে যাওয়া উচিত নয়? দেশে যদি আর একটা বিপ্লব শুরু হয়, স্বৈরাচারী শক্তি যদি শেষ লড়াই চালাতে চায়, তখন সেলিম এমন নিশ্চিন্তে দূরে বসে থাকবে? কিন্তু তার পক্ষে কি ফেরা সম্ভব? খুনের ওয়ারেন্ট আছে তার নামে। এয়ারপোর্টে তালিকা করা থাকে। ঢাকায় তার পাসপোর্ট দেখামাত্র তাকে অ্যারেস্ট করবে না? জেল পর্যন্ত কি নিয়ে যাবে, না আগেই গুলি করে মেরে ফেলবে? জেলের মধ্যেও বিনা বিচারে গুলি করে মারে।

একমাত্র এই সরকার যদি বদলায়, তাহলেই সে সুবিচারের আশা করতে পারে। কিন্তু এই সরকার বদলাবার আন্দোলনে তার যোগ দেবার উপায় নেই!

তবু, বিবেকের কাছে একটুখানি সান্ত্বনা আছে সেলিমের। গণতন্ত্রের সমর্থনে নানান সভা সমিতি করে বাংলাদেশের ছাত্ররা এখানে একটা জনমত তৈরি করছে। কিছু কিছু টাকা তুলে পাঠানো হচ্ছে ঢাকায়। একাত্তর সালের মতন যদি আর একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তা হলে মার্কিন জনগণের সমর্থন বিশেষ প্রয়োজন হবে। সেলিমও সেই সব সভাসমিতিতে তার অনুষ্ঠান দেখায়, সে এখন আর কোনো পয়সা-কড়ি নেয় না। একজন শিল্পী তো তার শিল্পটাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

সাইকেলটা এনে বাড়ির সামনে থামানোর পর সেলিম দেখলো, কাছেই একটা গাড়ি থেমে আছে, তাতে বসে আছে দু'তিনজন লোক। সে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা স্টার্ট দিল। সেলিম কৌতূহলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তার ধারণা, কয়েকদিন ধরে এরকম একটা গাড়িতে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এই গাড়িটা একেবারে তার সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতেই সেলিম এক লাফে খানিকটা পিছিয়ে গেল। গাড়ি থেকে কিন্তু কেউ নামলো না, আবার স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল হুস করে।

কয়েকদিন আগে হলেও সেলিম এই ব্যাপারটায় খুব ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ যেন তার ভয় চলে গেছে। ঢাকায় ছেলেরা মিলিটারির বন্দুক-বেয়নেট তুচ্ছ করেও রাস্তায় বসে পড়েছে, এই দৃশ্য দেখার পর মনে হয়, আমরা আর কত কাপুরুষ হবো? এ দেশের পুলিশ সম্পর্কেও ভয় চলে গেছে সেলিমের।

পরের শনিবার কাছাকাছি একটি শহরের বাঙালি ছেলেরা আমন্ত্রণ

জানালো তাকে। তারা বড় কোনো হলে রাজনৈতিক মিটিং করার অনুমতি পায়নি, তাদের কমিউনিটি সেন্টারে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। প্রথমে সেলিমের সেই বিখ্যাত ক্যারিকেচার দিয়ে লোক জড়ো করা হবে, তারপর কয়েকটি ছেলে গরম গরম বক্তৃতা দেবে।

সেলিম সবেমাত্র আরম্ভ করেছে অনুষ্ঠান, এই সময় দড়াম করে দরজা ঠেলে ঢুকলো দশ-বারোটি গুণ্ডা। কু ক্লুক্স ক্ল্যানের মতন তাদের প্রত্যেকের মুখ অর্ধেক রুমালে ঢাকা, তাদের কয়েক জনের হাতে হকি স্টিক, কয়েক জনের হাতে লোহার চেইন। ঢুকেই তারা চিৎকার করে উঠলো, মার শালাদের, মার, মেরে ধ্বজভঙ্গ করে দে শালাদের!

তারা মারামারি করার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে, দর্শকরা তো আর তা আসেনি। বিরাট ভয়ার্ত চিৎকার ও হইচই শুরু হলো, যে যেদিকে পারলো পালালো। যারা স্ত্রী বা বান্ধবীদের সঙ্গে এনেছিল, তারা ভয় পেল সবচেয়ে বেশি।

ব্যাপারটা কী হচ্ছে বোঝবার আগেই আততায়ীদের কয়েকজন লাফিয়ে উঠে এলো মঞ্চে। তারা প্রধানত সেলিমকে ধরার জন্যই এসেছে বোঝা যায়। এর মধ্যে কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে সব আলো। কয়েকটি শক্ত হাত সেলিমকে ধরে টানতে টানতে হল থেকে বার করে নিয়ে গেল পাশের গলিতে।

তিন-চারজন মিলে ফুটবল খেলতে লাগলো সেলিমকে নিয়ে। সে কোনো প্রতিরোধ করার সুযোগই পেল না। এক একটা ঘুসিতে তার দাঁত ভাঙছে, এক একটা চেনের ঘায়ে তার হাঁটু অবশ হয়ে যাচ্ছে।

সে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল, একজন তাকে চিত করে তার বুকের ওপর চেপে বসলো। দাঁতে দাঁত পিসে সে বললো, ইবলিশের বাচ্চা সেলিম, তুই আমার ছোট ভাইকে খুন করেছিস! আজ তোর শেষ দিন!

সেলিম দেখলো, এই সেই লোক, আগ্রা রেস্তোরাঁয় সে তার দিকে রাগ-রাগ চোখে তাকিয়ে ছিল, যার ঘাড়-গর্দান সমান, মুখখানা বুল ডগের মতন।

সেলিম বললো, না, আমি তোমার ভাইকে মারিনি!

লোকটি সেলিমের মুখে আর একটা ঘুসি কষালো।

অন্য একজন সেই লোকটির হাত ধরে টেনে তুলে বললো, আর

granthagar.weebly.com

বেশি দরকার নেই। ওর পাসপোর্টটা সামনে ফেলে রাখ, এরপর পুলিশ এসে ওর বাকিটা শেষ করে দেবে !

হঠাৎ যেন সেলিমের গায়ে অসুরের শক্তি চলে এলো। সে একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, আমায় ভয় দেখাচ্ছিস ? পালাচ্ছিস কেন, হারামি ! ডাক তোর বাপের কত পুলিশ আছে।

অন্ধের মতন ছুটে গিয়ে সেলিম সেই লোকটিকে কোমর জড়িয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করলো। পারলো না। লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা লাথি মারলো সেলিমের মুখে। সেলিম মাটিতে পড়ে গিয়ে রক্তবমি করতে লাগলো অনবরত।

কমিউনিটি সেন্টার থেকে কেউ পুলিশে খবর দিয়েছিল। সাত মিনিটের মধ্যে এসে গেল পুলিশের গাড়ি। তার দু' মিনিট পরেই স্থানীয় টিভি স্টেশনের ক্যামেরা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স। সব মিলিয়ে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগলে কর্তব্যে অবহেলা বলা যেতে পারতো ! ততক্ষণে অবশ্য আততায়ীরা হাওয়া !

সেলিম বেঁচে গেল। তবে হাসপাতালে তাকে থাকতে হলো বেশ কয়েকদিন। একটা হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। ভেঙে গেছে বুকের দুটো পাঁজরা, তার মোট সাতটা দাঁত নেই। বাঁ চোখটা আহত হয়নি অল্পের জন্য।

প্রথম দিন থেকেই অবশ্য সেলিমের জ্ঞান আছে। বিভিন্ন সাংবাদিক আসছে তার সাক্ষাৎকার নিতে। বাংলাদেশের ছাত্রদের বিদেশে দলাদলির খবর বেশ প্রাধান্য পেয়েছে এখানকার মিডিয়ায়। লন্ডনে বাংলাদেশের সামরিক শাসককে নিয়ে একটি বিদ্রূপ-নাটকের অভিনয়ের সময় একদল লোক হামলা করে অভিনেতাদের মেরেছিল, সেই ঘটনার সঙ্গে এখানকার ঘটনার দিন দেখানো হলো।

টিনা এলো তৃতীয় দিন। হাসপাতালের কম্পাউন্ডে গাড়িটা পার্ক করে সে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো গেটের দিকে। আসবে কি আসবে না, তা নিয়ে সে অনেক দ্বিধা করেছে। হাসপাতালে দেখতে আসা নিতান্তই একটা ফর্মালিটি ! রোগী কেমন আছে, তা ফোন করেই জানা দরকার। সেলিমের অন্য বন্ধু-বান্ধব কারুকেই চেনে না টিনা। তারা নিশ্চয়ই এখন সেলিমকে ঘিরে থাকবে, তাদের মাঝখানে গিয়ে পড়লে টিনার অস্বস্তি লাগবে !

টিনা আজ না আসতেও পারতো। লী'র সঙ্গে তার আজ ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা শুনতে যাবার কথা ছিল সন্ধেবেলা। লী

আর টিনা দু'জনেই এ ধরনের মিউজিক ভালোবাসে। কিন্তু দুপুরে লী হঠাৎ জানালো, সে আজ যেতে পারবে না। তার বদলে তার বন্ধু কিম নিয়ে যাবে টিনাকে। সে কথাটা শুনেই টিনার অন্তরাত্মা জ্বলে উঠেছিল। এর আগে কিম দু'বার তার বন্ধুকে না জানিয়ে টিনার সঙ্গে দেখা করেছে এবং তুচ্ছ ছুতোয় টিনাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছে। লোকটা বদ। লী ইচ্ছে করে টিনাকে ঠেলে দিচ্ছে কিমের দিকে ? টিনা কি শুধু একটি সেক্স অবজেক্ট ? তক্ষুনি টিনা ঠিক করেছিল, সে অর্কেস্ট্রা শুনতে যাবে না। সে-সেলিমকে দেখতে যাবে।

সেলিমের ঘরে যথেষ্ট ভিড় দেখবে ভেবেছিল টিনা। কারণ, নানান কাগজে সেলিমকে এক ট্র্যাজিক হিরো বানানো হয়েছে। একজন প্রতিবাদী শিল্পী। কিন্তু সেলিমের ক্যাবিনে বীথির স্বামী ইউসুফ ছাড়া আর কেউ নেই এখন। সেও টিনাকে দেখে সসম্ভ্রমে শিয়রের কাছের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

সেলিম দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

উঁচু চেয়ারটায় বসে টিনা কোনো দ্বিধা করলো না। সেলিমের বাহুতে তার ডান হাতের পাঞ্জাটা ছোঁয়ালো। সঙ্গে সঙ্গে এদিকে ফিরে তাকালো সেলিম।

টিনা জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, সেলিম ?

সেলিম কোনো উত্তর দিল না, শুধু তাকিয়ে রইলো টিনার মুখের দিকে। অসম্ভব গভীর সেই দৃষ্টি। এতটাই গভীর যে, টিনাও কোনো তল পেল না। সেলিমকে এভাবে তাকাতে সে কখনো দেখেনি।

বোঝাই যায় যে সেলিমের পরিষ্কার জ্ঞান আছে, টিনাকে সে চিনতেও পেরেছে, তবু সে কোনো কথা বলছে না, যেন তার দৃষ্টিটাই যথেষ্ট।

সেই দৃষ্টি বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পেরে টিনা অন্যদিকে মুখ ফেরালো। ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তাররা কী বলছেন ?

ইউসুফ বললো, ক্রাইসিস কেটে গেছে। বুকে নিউমোনিয়া হবার ভয় ছিল, সেটা হয়নি।

টিনা বললো, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি, আমি সেলিমের একজন বন্ধু। আমার নাম টিনা দত্ত।

ইউসুফও নিজের পরিচয় দিল।

টিনা মুখ ফিরিয়ে দেখলো, এখনো সেলিম তার দিকে একই ভাবে তাকিয়ে আছে। কম্বল থেকে বেরিয়ে এসেছে তার একটি হাত।

টিনা এর আগে কোনোদিন নিজে থেকে সেলিমের হাত ধরেনি।

আজ সেই হাতটা ছুঁলো। সেলিম এখনো কোনো কথা বললো না, কিন্তু তার আঙুলে উষ্ণতার ভাষা বোঝা গেল।

টিনা বললো, সেলিম, তুমি ভালো হয়ে যাবে!

সেলিম তবু কোনো কথা বললো না।

টিনা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কথা বলা বারণ?

সেলিম আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়লো।

ইউসুফ বললো, না, না, একটু আগে তো আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হয়তো কিছুটা টায়ার্ড। আপনি কোথায় থাকেন?

টিনা বললো, সেন্ট হেলেনা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে।

এই সময় তিন-চারজন নারী-পুরুষ একসঙ্গে ঢুকলো ক্যাবিনে। তখনও সেলিমের হাতের আঙুলের সঙ্গে টিনার আঙুল জড়ানো।

ইউসুফ কিছু একটা বুঝতে পেরে, আগন্তুকদের মধ্যে শুধু একজনের দিকেই ইঙ্গিত করে বললো, ইনি জুলেখা বেগম, সেলিম সাহেবের স্ত্রী।

জুলি বললো, হাই!

টিনা নিজের হাতটা খুলে নিল। চেয়ার থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বললো, হাই! আমার নাম টিনা। সেলিমকে অনেকদিন চিনি, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে শুনে ওকে একবার দেখতে এলাম।

grenthagar.weebly.com

জুলি বললো, বুঝেছি। সেলিম যখন প্রথম এদেশে আসে, তখন তোমাদের বাড়িতে ছিল কিছুদিন। আমাকে গল্প বলেছে।

টিনা বললো, আমার বাড়ি না। আমার দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি। তাঁরা ওকে খুব পছন্দ করেন। তাঁরাও খুব কনসার্নড।

জুলি বললো, থ্যাঙ্কস!

ইউসুফ বললো, মিজ দত্ত, আপনি তো বুঝতেই পারছেন, পুলিশ খুব ঝামেলা করার চেষ্টা করছিল। সেলিম সাহেবের সব পেপার্স ঠিক ছিল না। সেই সময় জুলেখা ভাবী দারুণ লড়ে গেছেন। শী ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ হিয়ার। ওঁর একটা জোর আছে...

টিনা মন দিয়ে ইউসুফের কথা শুনলো না। জুলি যে সেলিমের স্ত্রী, কবে বিয়ে হলো, কেমন করে হলো, এ সম্পর্কেও তার কোনো কৌতূহল নেই। সে সেলিমের ঐ নীরব দৃষ্টির অর্থ খোঁজার চেষ্টা করছে।

সেলিম যেন টিনাকে দেখে একটুও অবাক হয়নি, সে যেন জানতো টিনা আসবেই। এক রাত্তিরে অপমান করে সেলিমকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তবু সে জানতো যে টিনাকে আসতেই হবে?

লি'র ওপর রাগ করে অর্কেস্ট্রায় যাবে না ঠিক করার পরই সেলিমের কথা তার মনে পড়লো কেন ? সেলিমের ব্যবহার কখনো তার মনে সেরকম দাগ কাটেনি। তার অতি সারল্য অনেকটা বোকামির কাছাকাছি। হঠাৎ একদিন গিয়ে বললো, তুমি আমার সঙ্গে ডিকল্‌ব শহরে চলো। ওরকম কেউ বলে ? টিনার রাগ হবে না ? তবু টিনা আজ ওকে দেখতে এলো কেন, নিছক ভদ্রতা ?

ঘরের মধ্যে অন্যরা কথা বলছে, টিনা যেন সেখানে থেকেও নেই। তার হাতটা একটু একটু কাঁপছে। টিনা অবাক হয়ে গেল, হঠাৎ তার নার্ভাসি লাগছে কেন ? কেউ তো তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে না। এমনকি জুলির ব্যবহারেও কোনও আড়ষ্টতা নেই, সে সেলিমকে কী যেন বললো, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলো না, চর্কির মতন ঘুরতে লাগলো ঘরের মধ্যে। মেয়েটা খুব ছটফটে ধরনের।

আর বেশিক্ষণ এখানে থাকার মানে হয় না। বাকি সবাই সেলিমের খুব কাছের লোক। টিনা এখানে বেমানান।

সে সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, যাই ?

সেলিম এবারও কোনো শব্দ করলো না। তবু যেন টিনার চোখের দিকে তাকিয়ে পাঠিয়ে দিল এক ঝলক নীরব বার্তা।

ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে, লিফ্‌ট না নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো টিনা। সব সময় এত সে সপ্রতিভ, তবু এখন যেন তার চোখে একটা ঘোর লেগে আছে। সেলিম তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। কিন্তু তার ঐ তীব্র গভীর চাহনির অর্থও আর কেউ বোঝেনি। টিনাও বোধহয় আগে এমন সম্পূর্ণভাবে চেয়ে দেখেনি সেলিমের মুখের দিকে। আজকেই সে ছিল যথার্থ মূকাভিনয় শিল্পী, কথা বলার প্রয়োজনই ছিল না কিছু।

টিনার চোখে জল এসে গেল।

সে উপলব্ধি করলো, ঠিক আজকের মতন মুখ ও দৃষ্টি নিয়ে সেলিম যদি বলতো, আই লাভ ইউ, কিংবা, এই উইক এন্ডে চলো ডিকল্‌্ষ শহরে, তা হলে কি টিনা ওকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতো ?

তা হলে টিনার জীবনটাও অন্যরকম হয়ে যেত !